এপ্রিল ২০২৪ ■ চৈত্র ১৪৩০-বৈশাখ ১৪৩১

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

বৈশাখ বাঙালির একটি বাতিঘর

পড়শী চক্রবর্ত্তী, অষ্টম শ্রেণি, হিরা মিয়া গার্লস হাই স্কুল, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

তাসপিয়া হোসেন, দশম শ্রেণি, ফরিদা জামান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বাড্ডা, ঢাকা

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, তোমাদের সবার জন্য রইল বাংলা নতুন বছর ১৪৩১-এর আন্তরিক শুভেচ্ছা। নববর্ষ বাঙালি জীবনে নতুনের আবাহন। পুরাতন ও অসুন্দরকে বিদায় দিয়ে সুন্দর আগামী ও আনন্দকে বরণ করার সর্বজনীন উৎসব আমাদের নববর্ষ। সত্য, সুন্দর ও আনন্দের সম্মিলন। বাংলাদেশের মানুষের প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ। নববর্ষকে বরণ করার মহোৎসব হলো মঙ্গলশোভাযাত্রা। এছাড়াও এদিনটি উপলক্ষ্যে গ্রামগঞ্জে, শহর-বন্দরে সকলে মিলে এক নির্মল আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। তোমরাও শামিল হও মনের খুশির দুয়ার খুলে।

ঈদ অর্থ উৎসব। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। বিশ্বজুড়ে এই ঈদকে ঘিরে চলে নানা প্রস্তুতি। ঈদের চাঁদ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে সকলে। এ দিনে নতুন জামা কাপড় পরে ঈদগাহে নামাজ পড়া, নামাজ শেষে কোলাকুলি করা, একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ে মেতে উঠে। বন্ধুরা, তোমরাও বাড়ির বড়োদের কাছ থেকে পেয়ে যাও নতুন টাকার সালামি।

১০ই এপ্রিল ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার 'মুজিবনগর সরকার' গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (বর্তমানে মুজিবনগর) এ সরকারের সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন। এই সরকার গঠনের ফলে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ প্রবল যুদ্ধে রূপ নেয়। স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত হয়। আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি ইতিহাসের অমর বীর সেনাদের।

ভালো থেকো বন্ধুরা, তোমাদের অফুরন্ত শুভ কামনা।

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
কাজী শাম্মীনাজ আলম

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

সূচি

নিবন্ধ

০৩ শোনো মুজিবনগর সরকারের কথা
মো. সিরাজুল ইসলাম
১৪ বৈশাখ বাঙালির একটি বাতিঘর/ মিনার মনসুর
২৫ আনন্দ যাপনের বৈশাখ/ ইমরুল ইউসুফ
৩৭ সেকালের গ্রামের ঈদ/ মুন্সি মো. নজরুল ইসলাম
৪৯ পান্তাভাত কথন/ হাফিজুর রহমান
৫৬ প্রাণীদের ঘুম রহস্য/ বশিরুল আলম

গল্প

০৮ হ্যালো ঘুম!/ মনি হায়দার
১৮ আমি একটা শুকনা পাতা/ তারিক মনজুর
২২ বায়জিদের দেখা বৈশাখি মেলা/ দুখু বাঙাল
৩০ বনরাজের বৈশাখনামা/ তারিকুল আমিন
৪১ পদ্মপুকুরের জোড়া তালগাছ/ কুমার প্রীতীশ বল
৪৫ মোবাইল ম্যানিয়া/ নাজমুল হুদা

কবিতায় ঈদ

৩৪ রুস্তম আলী/ গোলাম নবী পান্না/ আতিক রহমান
৩৫ শাহরিয়ার শাহাদাত/ মঈনুল হক চৌধুরী
এইচ এস সরোয়ারদী
৩৬ মিতুল সাইফ/ ফরিদ সাইদ/ রাশেদ আহাম্মেদ সাদী
৪০ সালাম ফারুক

কবিতায় বৈশাখ

১৩ শাফিকুর রাহী/ বিচিত্র কুমার/ সজীব মালাকার
২১ মিজানুর রহমান মিথুন/ আবদুল হামিদ মাহবুব
তোফাজ্জল হোসেন তালুকদার/ সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম
২৪ মনির জামান

সাফল্য প্রতিবেদন

৫১ প্রথম জাতীয় মিষ্টি মেলা/ শাহানা আফরোজ
৫৩ প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার পেলেন বিশেষ শিশু
মো. নাজমুল হোসেন
৫৪ শিশুর কিডনি রোগে সচেতনতা/ মো. জামাল উদ্দিন
৫৫ আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহে রকেট/ তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
৫৮ ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম/ জান্নাতে রোজী
৫৯ ইউটিউব দেখে বিমান তৈরি/ মেজবাউল হক
৬০ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফফাত আঁখি
৬২ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

ছোটোদের ছড়া

২৮ শাহীনা আক্তার/ তাসিন হোসেন/ হাসিবুল ইসলাম
৪০ মৌমিতা ইসলাম

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : পড়শী চক্রবর্তী/ তাসপিয়া হোসেন
শেষ প্রচ্ছদ : সিরাজুম মুনিরা বিভা
২৮ সিদরাতুল মুনতাহা
৪৪ মুজতানিবা মোজাহিদ
৫৭ নাফিসা তাবাসসুম তাজ
৬৩ নুরুন নাহার মিম
৬৪ সাবা তাসনিম/ আফিয়া যাহীন খান

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (*Nobarun Potrika*) আপলোড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট *www.dfp.gov.bd*- এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

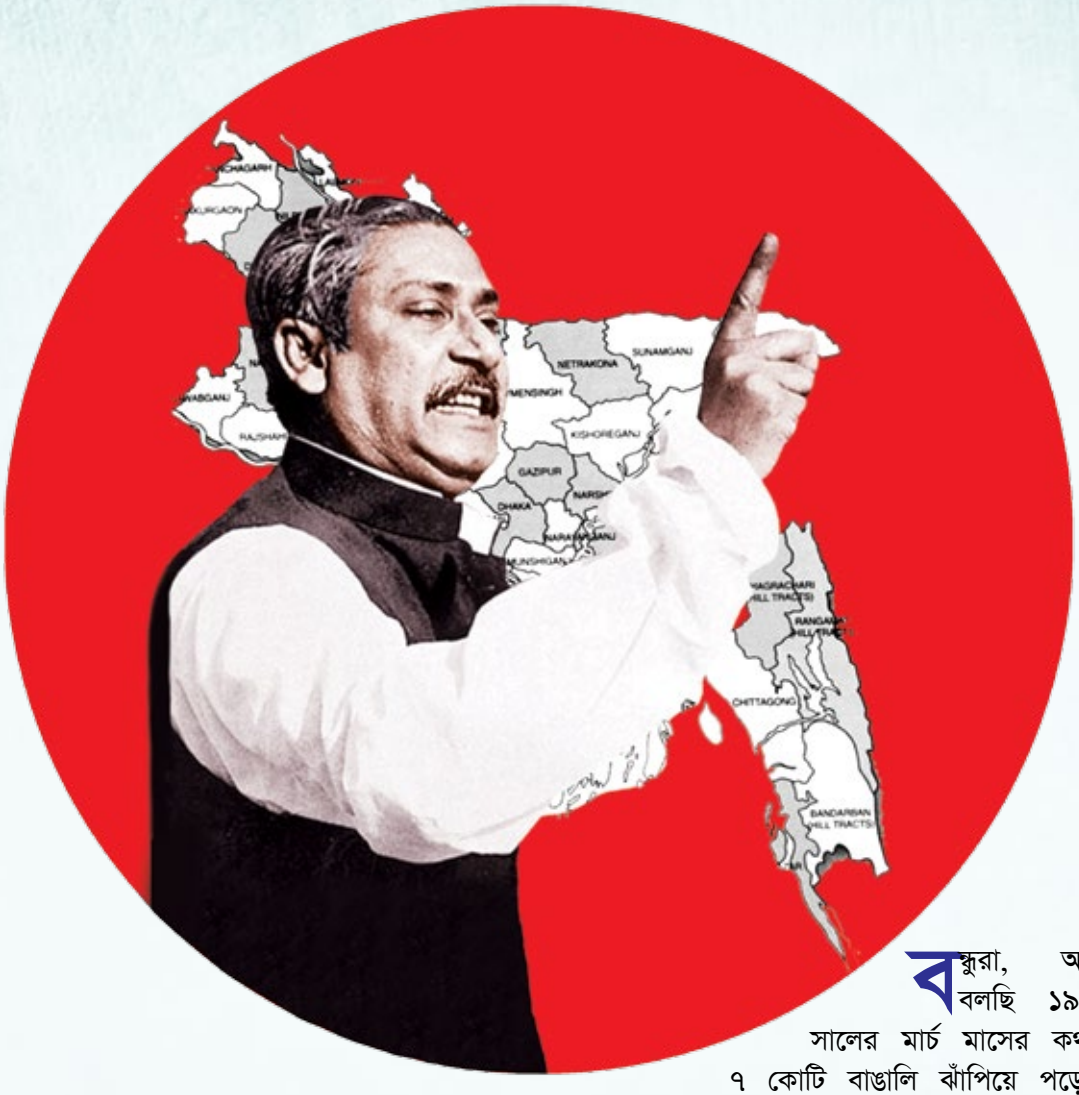

শোনো মুজিবনগর সরকারের কথা

মো. সিরাজুল ইসলাম

বন্ধুরা, আমি বলছি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের কথা। ৭ কোটি বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুক্তির সংগ্রামে। স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বঙ্গবন্ধু তখন পাঞ্জাবের লায়ালপুর কারাগারে বন্দি। বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাইরে গিয়ে প্রবাসে থেকে একদল দেশপ্রেমিক বাঙালি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিচ্ছে। এদিকে পাকিস্তান সরকার বিশ্বব্যাপী প্রচার করছে, এরা বিচ্ছিন্নতাবাদী। ঠিক তখনই মুক্তিযুদ্ধ শুরুর এক মাসের মধ্যেই ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠন করা হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার যা 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত।

মুজিবনগর সরকার গঠন কেন দরকার ছিল?

মুক্তিযুদ্ধকে সঠিক পথে পরিচালনা করা এবং দেশ ও বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও সমর্থন আদায় করার জন্য এই সরকার গঠন করা জরুরি হয়ে পড়ে। মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমেই বহির্বিশ্বের মানুষ জানতে পারে যে,বাংলাদেশের মানুষ ন্যায়সঙ্গতভাবে লড়াই করছে। এবং মুক্তিযুদ্ধের গতি বৃদ্ধি পায়।

কুষ্টিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় গঠিত হয় এই সরকার। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর দেশের বিভিন্ন জেলা একের পর এক পাক সেনাদের দখলে চলে যায়। ফলে সীমান্তের কাছাকাছি এই আমবাগানকেই নিরাপদ স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। সরকার গঠনের পর থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই এই সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয় কলকাতা থেকে। এই সরকারকে অনেকেই প্রবাসী সরকার, অস্থায়ী সরকার কিংবা বিপ্লবী সরকারও বলে থাকে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। সে অবস্থায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার আগে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তখনই পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় নতুন দেশ 'বাংলাদেশ'। এরপর শুরু হয় দেশকে শত্রুমুক্ত করার পালা। পরাধীনতার শেকল ভাঙার জন্য, মুক্তির জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তাই তো মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ করেছিল সেটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধ।

মুজিবনগর সরকার তখন কী করছিল? একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সরকার। এই সরকার নবীন রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিল। পাকিস্তানের কাছ থেকে বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে জনমত তৈরি করেছে। কূটনৈতিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করেছে। এই সরকারের উদ্যোগে ১৯৭১ সালের ১১ই জুলাই মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়। তারা মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা বাহিনীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে বীরত্বপূর্ণ,সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছে। বিদেশ থেকে অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করেছে। ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের জন্য কাজ করেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের পক্ষে এনেছিল।

এবার আরো একটু পিছন থেকে বলি।

শপথ গ্রহণের পর গার্ড অব অনার নিচ্ছেন মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম

কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের এই বাড়িটি থেকে পরিচালিত হতো মুজিবনগর সরকার

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়। তবুও ক্ষমতায় বসতে দেওয়া হয়নি আওয়ামী লীগকে। কারা ক্ষমতায় যেতে দেয়নি? পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা। অতঃপর সেই নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়েই গঠন করা হয় বাংলাদেশের এই সরকার। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সরকার দেশ-বিদেশে সমর্থন পায়, আইনগত বৈধতা লাভ করে। কোন জায়গায় বসে সরকার গঠন করা হয়েছিল? স্থানটা ছিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায়। মন্ত্রিপরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় ১০ই এপ্রিল। রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম আর উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানের কারাগারে। তাই, তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের উপর। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হয় তাজউদ্দীন আহমদের নাম। ওই দিন নবগঠিত এই সরকার স্বাধীনতার একটি ঘোষণাপত্রও গ্রহণ করে।

পরের দিন ১১ই এপ্রিল ঘোষণা করা হয় অন্যান্যদের নাম। সেনাপ্রধান হিসেবে ঘোষণা করা হয় কর্নেল এম এ জি ওসমানীর নাম আর সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ হিসেবে কর্নেল আবদুর রবের নাম ঘোষণা করা হয়। ১২টি মন্ত্রণালয় ও রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা ঘোষণা করা হয়।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তাজউদ্দীনের ভাষণ প্রচারিত হওয়ার পর যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা এবং জনগণের মধ্যে আনন্দের ঢেউ সৃষ্টি হয়। মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য হাজার হাজার মানুষ তখন দেশের অভ্যন্তরে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। একই সঙ্গে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য অনেকেই সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যেতে থাকেন।

এবার নতুন সরকারের শপথ নেবার পালা। এদিকে ১০ই এপ্রিল সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর এলাকায় পাকিস্তানিদের আক্রমণ ও বোমাবর্ষণ বেড়ে যায়। সেই পরিস্থিতিতেও মেহেরপুরের নিভৃত একটি অঞ্চলকে বাছাই করা হয় সরকারের শপথ অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। ১৭ই এপ্রিল বৈদ্যনাথতলা গ্রামের ঘন আমবাগানের পাশের মিশনারি হাসপাতাল থেকে কাঠের ৬টি সাধারণ চেয়ার আর টেবিল এনে মঞ্চ তৈরি করা হয়। ভাবলে অবাক হবেন, মঞ্চটি ছিল একেবারে খোলা আকাশের নিচে। রাষ্ট্রপতির চেয়ারটি খালি রেখে অন্য চেয়ারগুলো পদ অনুসারে বসানো হয়। সকাল ৯টা থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ আসতে শুরু করেন। সেদিন শনিবার বেলা ১১টার দিকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ সরকারের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ মঞ্চে আসীন হলে স্বাধীনতার শপথ পাঠ করান গণ-পরিষদের স্পিকার ইউসুফ আলী। তিনি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও পাঠ করেন। এর আগে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত লাল-সবুজ পতাকা উড়ানো হয়। সেই সাথে গাওয়া হয় জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি...'। আর নতুন দেশের নাম রাখা হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'।

ঝিনাইদহের এসডিও মাহবুব উদ্দিন উপস্থিত আনসার বাহিনীর ১২জন সদস্য নিয়ে সরকারকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

শপথ গ্রহণের পর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ইংরেজি ভাষণে সারা বিশ্বকে নতুন রাষ্ট্র ও সরকারের লক্ষ্য আর কর্মসূচি জানিয়ে দিলেন। স্বাধীনতাকামী বাঙালির আন্দোলনকে পাকিস্তান সরকার বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে যে প্রচার করছিল তাতে পানি ঢেলে দেয় নতুন তৈরি এই বাংলাদেশ সরকার। উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের ভাষণ শেষে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধারা গগনবিদারী কণ্ঠে– তোমার নেতা, আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব বলে স্লোগান দিতে থাকেন।

অবিশ্বাস্য সেই শপথ অনুষ্ঠান ছিল একেবারেই অনাড়ম্বর। শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শতাধিক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ।

শপথ গ্রহণের স্থান ত্যাগের আগে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করেন 'মুজিবনগর'। সেই থেকেই এই সরকারকে 'মুজিবনগর সরকার' হিসেবে অভিহিত করা হয়। তখন থেকে আমাদের বাংলাদেশের সরকার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। নতুন সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সফল করার জন্য প্রশাসন, অর্থ, কূটনীতি প্রভৃতি উপদেষ্টা পরিষদ গড়ে তুলতে থাকে।

শপথের পর নতুন সরকার নিরাপত্তার প্রয়োজনে কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়িতে অবস্থান নিয়ে দৈনন্দিন কাজ করতে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহচর,তাঁর নির্দেশমতো স্বাধীনতার লড়াইয়ে শামিল হতে সর্বস্তরের জনগণকে আহ্বান জানান। দেশের সীমানার বাইরে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর দলের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের প্রতি জনগণেরও গভীর আস্থা ছিল। অল্প কয়েকটি দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। ভারত,রাশিয়া (তখনকার

সোভিয়েত ইউনিয়ন), যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের অধিকাংশ সরকার ও জনগণ বাংলাদেশের এই প্রথম সরকারকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংস্থাও বঙ্গবন্ধুর সরকারকে,মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানিয়েছে। ১৬ই ডিসেম্বরের আগেই ভারত, ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনারা মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এভাবেই বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্বমহিমায় নিজ দেশে ফিরে এসেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বপ্রদানকারী মুজিবনগর সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। ১০ই এপ্রিল থেকে যাত্রা শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর, মাত্র নয় মাসে এই সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল। তাই তো আমরা পেয়েছি লাল-সবুজ পতাকার প্রিয় স্বদেশ। মুজিবনগর হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী। আর এজন্যই মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

বন্ধুরা,বলো তো দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আমরা এখন কী করব?

মুক্তিযোদ্ধাদের আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলব। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ থাকব। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এক হয়ে থাকব। আমরা যার যার কাজ সবচেয়ে সুন্দরভাবে করতে চেষ্টা করব। ❑

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বিএল কলেজ, খুলনা

তথ্যসূত্র/ কৃতজ্ঞতা:

১। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

২। ড. মো: মাহবুবর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস: ১৯৪৭-৭১,ঢাকা,নভেম্বর,২০০৬,পৃ.২৪২-২৫৮।

৩। মো: মুজিবুর রহমান, মুজিবনগর সরকার-স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার, সচিত্র বাংলাদেশ ,ঢাকা, এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ৪৭-৪৯।

৪। খালেক বিন জয়েনউদ্দীন,আত্মপরিচয়ের প্রথম ঠিকানা-মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা, সচিত্র বাংলাদেশ, ঢাকা, এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ৫০-৫২।

৫। তানিয়া লাবণ্য, ডেটলাইন: মুজিবনগর, ১৭ এপ্রিল, দৈনিক কালেরকণ্ঠ, ঢাকা, ১৭ এপ্রিল, ২০১১, পৃ: (স্পটলাইট) ০১।

৬। এইচ.টি ইমাম, বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, ২০০৪;

৭। নূরুল কাদের, একাত্তর আমার, ১৯৯৯;

৮। শামসুল হুদা চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর, ১৯৮৫;

৯। বিবি বিশ্বাস, একাত্তরে মুজিবনগর, ২০০০;

১০। মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা, ২০০৮।

১১। আকবর আলি খান, মুজিবনগর সরকারের শেষের কয়েকটি দিন,

১২। আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন,মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর সরকার , যুগান্তর, ১৭ই এপ্রিল ২০২২

১৩। মোনায়েম সরকার : মুজিবনগর সরকার : কাছ থেকে দেখা ১০ই এপ্রিল ২০২২

১৪। ইতিহাসের অবিস্মরণীয় অধ্যায়: মুজিবনগর সরকারের ৫০ বছর মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, ১৭ই এপ্রিল, ২০২১

১৫। মো. সিরাজুল ইসলাম, ১৭ই এপ্রিল : মুজিবনগর দিবস ও মুজিবনগর সরকার, নবারুণ, এপ্রিল ২০২১

১৬। মুঈদ রহমান, মুজিবনগর সরকার গঠন প্রক্রিয়াটি খুব সহজ ছিল না, যুগান্তর, ১৭ই এপ্রিল ২০২২

১৭। 'মুজিবনগর সরকার থেকেই রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল' যুগান্তর প্রতিবেদন, ১৮ই এপ্রিল ২০২২

১৮। এম. এ. বাসার, মুজিবনগর সরকার: প্রেরণার বাতিঘর, যুগান্তর ১৭ই এপ্রিল ২০২১

১৯। মুজিব থেকে মুজিবনগর সরকার, ইত্তেফাক অনলাইন ডেস্ক, প্রকাশ : ১৯শে জুন ২০২১

২০। প্রথম আলো ডেস্ক, প্রকাশ: ১৭ই এপ্রিল ২০১৯, ০৭ ডিসেম্বর ২০২১, ১৭ই এপ্রিল, ২০২৪

২১। ঐতিহাসিক মুজিনগর দিবস আজ, ডেইলি স্টার, ১৭ই এপ্রিল ২০২২

২২। হিমন এডওয়ার্ড গমেজ, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা জুলাই ২০২১

২৩। ইমরান ভূঁইয়া, দেশ রূপান্তর, ১০ই এপ্রিল ২০২১

২৪। ইমরান হুসাইন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২১

গল্প

n¨v‡jv Ng!

মনি হায়দার

পর্দাটা আবার দুলে উঠল।

রাত বারোটা। ড্রয়িংরুমে বসে লিখছি। আশপাশের কেউ জেগে নেই। একমনে লিখে চলেছি। পর্দাটা আবারো দুলছে একনাগাড়ে। আমার হাসি পাচ্ছে আবার রাগও হচ্ছে। মাথাটা কাত করে তাকালাম। পর্দার আড়াল থেকে ছোটো গভীর কারো এক জোড়া চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটে ঝুলছে কুমড়ো ফালির এক টুকরো মিষ্টি হাসি। আসলে পায়রা ঘুমায়নি।

পায়রাকে চেনো না! ভারি অবাক কাণ্ড তো! পায়রা মানে পায়রা। সাড়ে চার বছরের কাট্টুস-টুক্টুস একটি চঞ্চল মেয়ে যার চোখে-মুখে, হাত-পায়ে সাত রাজ্যের দুষ্টুমি। কখন যে সে কী করবে কী বলবে বলা মুশকিল। সারাদিন পর সন্ধ্যায় ফিরে তাকে নিয়েই কাটে আমার সময়। তার ছোট্ট মুখে বিরামহীন অজস্র কথা, কথার ফুলঝুরি।

পাপা তোমার অফিসে কি কলা পাওয়া যায়?

কলা? হ্যাঁ, পাওয়া যায়।

আম?

পাওয়া যায়।

বিস্কিট?

তাও পাওয়া যায় মা।

হাতি? হাতিও থাকে তোমাদের অফিসে?

না গো মা। আমার অফিসে হাতি পাওয়া যায় না।

এতক্ষণ কথা বলছিল আমার কোলে বসে, দোল খেতে খেতে। সে চট করে আমার কোল থেকে নেমে দাঁড়ায়- তোমার অফিস পচা। আমি বড়ো হয়ে হাতি পাওয়া যায় এমন অফিসে চাকরি করব, হ্যাঁ।

কী আর করা! আমিও মেনে নিই, ঠিক আছে মা।

মুখে একটি আঙুল পুরে গম্ভীর হয়ে আবার জিজ্ঞেস করে-আচ্ছা পাপা, চাকরি কী?

চাকরি! চাকরি যে কী, কী উত্তর দেবো ভেবে পাই না।

তো এই হচ্ছে পায়রা, তার জিজ্ঞাসা। ঘটনা আরো আছে। তোমরা যদি কেউ আমাদের বাসায় আসো

দেখতে পাবে পায়রার অসাধারণ সব কাণ্ডকারখানা। ঘরের দেয়াল জুড়ে হরেক রঙের কিম্ভূতকিমাকার শিল্পকর্ম। হাতি, ঘোড়া, বাঘ, হরিণ, মুরগি, হাঁস, বেলুন, থালা, বাটি, বালিশ, মশারি, জুতো, জামা, প্যান্ট, শার্টের, ছবি আঁকা রয়েছে দেয়ালে। যতই চোখ রাঙিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি এসব কে এঁকেছে? পায়রা, সে যেখানেই থাকুক, এক দৌড়ে ছুটে আসে। মুখে চাঁদের হাসি টেনে গর্বের সঙ্গে জবাব দেয় পাপা, আমি এঁকেছি সুন্দর না!

আচ্ছা তোমরাই বলো, এমন মেয়েকে কি শাসন করা যায়! উলটো বলতে হয়, বাহ্! তুমি খুব সুন্দর ছবি এঁকেছ তো!

এই যা! আসল কথাটাই বলা হয়নি। পায়রা দারুণ গল্প বলতে পারে। ধরো যে তুমি এখন এই গল্পটি পড়ছ, যদি বাসায় আসো একদিন বেড়াতে এবং পায়রাকে জিজ্ঞেস করো পায়রা তুমি গল্প জানো?

প্রবলবেগে মাথা দুলিয়ে জবাব দেবে জানি।

তাহলে একটা গল্প বলো তো।

সঙ্গে সঙ্গে পায়রা খুব গম্ভীরভাবে বিছানায় বসে বলবে, গল্প যদি শুনতে চাও, দুষ্টুমিটা ছেড়ে দাও লক্ষ্মী হয়ে বসো।

আচ্ছা-আচ্ছা বসলাম।

শোনো, এক যে ছিল আজা-আজা মানে রাজা।

তারপর?

এক যে ছিল আজা, পায়রা আসলে এই পর্যন্ত বলতে পারে। কিন্তু তার ভাবসাব দেখলে তোমাদের মনে হবে পায়রার পেটের মধ্যে শোল, গজার আর ডানকিনে মাছের মতো অনেক অনেক গল্প সাঁতার কাটে।

পায়রা ঘুমায় কখন, জানো?

রাত একটা, দেড়টা-দুটোয়। বিশ্বাস হচ্ছে না! বাসায় আসো এক রাত দেখে যাও। এই যেমন আজকের রাতটার কথাই বলছি। বাসায় এসেছি রাত আটটা তিরিশ মিনিটে। সঙ্গে বিস্কিট আর মিমি। পায়রা আর তার বড়ো ভাই অরণ্য খুব মজা করে বিস্কিট আর মিমি খায়। আমি ভাত খেলাম। তারপর টিভি দেখতে বসলাম। রাত সাড়ে দশটা বাজে। অরণ্য ঘুমিয়ে কাদা। ওদের মা হাই তুলছে। কিন্তু পায়রা?

পায়রার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে মাত্র সকাল হলো। বিছানায় তার সব খেলনা এনে জমা করেছে, আমায় ডাকছে, এসো পাপা খেলি!

এত রাতে কেউ খেলে?

চারদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে পায়রা রাত খুঁজছে। শেষে নিজের মনে নিজেই খেলতে থাকে। এদিকে আমার ভীষণ তাড়া। এই গল্পটি লিখে শেষ করতে হবে। কিন্তু পায়রা জেগে থাকবে আর আমি গল্প লিখব সেটা কখনো হবার নয়। আমি লিখতে বসলেই সে ছুটে আসে, পাপা!

কী?

তুমি কী করছ?

লিখছি।

কী লিখছ?

গল্প।

কার গল্প?

কার আবার! তোমার গল্প লিখছি।

অবাক চোখে তাকায় আমার গল্প! দেখি দেখি নিমেষে চোখের পলকে চিলের মতো ছোঁ মেরে আমার গল্প লেখার কাগজটা নিয়ে যায়। কাগজটা নিয়েই সে ক্ষান্ত হয় না। কিছুক্ষণ পর কলমটাও নিয়ে যায়। খুব আয়েশ করে বসে টেবিলের ওপর। কাগজটাও রাখে। কলমটা রাখে কাগজের ওপর। দুই হাত গালে রেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়। আড়চোখে আমার দিকে তাকায়। আবার চিন্তায় ডুবে যায়। পায়রার ভাবসাব দেখে হাসি পাচ্ছে আমার, আবার অবাকও হচ্ছি। এতটুকু মেয়ে এসব কৌশল পায় কোথায়? ওর মাথায় কি কম্পিউটার সেট করা আছে?

মা তুমি কী করছ?

ভাবছি পাপা!

কী ভাবছ মা?

গল্প ভাবছি। তুমি কিছু বোঝো না পাপা। আচ্ছা

আমি তাকাই।

পায়রা খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে পাপা আমি একটা গল্প আঁকি!

চোখ জুড়ে ঘুম। হাই তুলি। গভীর রাতে পায়রা আমার কাগজ-কলম-টেবিল দখল করে ভাবতে বসেছে। ভেবে ভেবে গল্প লিখতে চায়। কী আর করা। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলি, লেখো।

গুড ইউ, পায়রা আমাকে থ্যাঙ্ক ইয়্যুর পরিবর্তে 'গুড ইউ' জানিয়ে গভীর মনোযোগে গল্প লিখতে শুরু করে। প্রথমে কাগজটার ঠিক হৃৎপিণ্ড মানে মাঝ বরাবর একটি কিম্ভূতকিমাকার পাখি আঁকার চেষ্টা করে। পাখিটা সে আঁকতে পারছিল না। খুব বিরক্তির সঙ্গে আমার দিকে তাকায়। পাপা গল্প তো আঁকা যাচ্ছে না।

ঘুমুতে না পারার দুঃখে হেসে বলি-মা, গল্প তো আঁকে না, লেখে।

চটে যায় সে। তুমি কিছু জানো না। গল্প আঁকে। এই দেখো সে সাদা কাগজটার ওপর আড়াআড়ি কয়েকটা টান দেয়। তার তীব্র টানে কাগজটা ছিঁড়ে দু-তিন টুকরায় ভাগ হয়ে যায়। ছেঁড়া কাগজ চোখের সামনে তুলে ফিক করে হাসে পাপা, দেখো আমার কী সুন্দর চশমা।

আমার গল্প লেখার কাগজটা হয়ে যায় পায়রার চশমা। ঘুমের ক্লান্তিতে চোখ জুড়িয়ে আসে। অথচ গল্পটি লেখা খুব দরকার। পায়রা জেগে থাকলে গল্প লেখা হবে না। ওর হাত থেকে কাগজ-কলম নিয়ে ড্রয়ারে রেখে দ্রুত ওকে কোলে নিলাম। লাইট নিভিয়ে পায়রাকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে অন্ধকার ঘরে পায়চারি করছি। বেশ

কিছুক্ষণ পর মনে হলো পায়রা ঘুমিয়েছে। পাশের ঘরে ওকে ওর মায়ের কাছে শুইয়ে ড্রয়িংরুমে এসে গল্পটা আবার লিখতে বসি লাইট জ্বালিয়ে।

গভীর মনোযোগ দিয়ে গল্পটা লিখছি। গল্পের মাঝখানে উত্তেজনার মধ্যে আছি। কিন্তু পর্দাটা দুলে উঠল। মুহূর্তমাত্র! পায়রা দু'পায়ে অপরূপ ছন্দ তুলে আমার কাছে দৌড়ে আসে। মুখে অনাবিল হাসি। চোখে কৌতুক। আমার শরীর ঘেঁষে দাঁড়ায়। টেবিলের ওপর কলমটাকে শুইয়ে রেখে তাকাই পায়রার দিকে।

ঘুমাওনি মা?

না।

রাত তো অনেক হয়েছে মা! ঘুমানো উচিত তোমার।

টেবিলে শুইয়ে রাখা কলমটা নিয়ে নিজের হাতের তালুতে ঘড়ি, ফুল, লতাপাতা আঁকতে আঁকতে আপন মনে জবাব দেয় আমি তো ঘুমুতে চাই। কিন্তু চোখে ঘুম না এলে কী করে ঘুমাই?

তোমার চোখে ঘুম আসে না কেন?

ঘুম আসবে কী করে? ঘুম তো বেড়াতে গেছে।

ঘুম বেড়াতে গেছে, পায়রার কথায় মাঝরাতে হাসব কী কাঁদব বুঝতে পারি না। পায়রা আবার আমার কাগজ-কলম নিয়ে ছবি আঁকছে। জিজ্ঞেস করি মা, তোমার চোখের ঘুম কোথায় বেড়াতে গেছে?

নানাবাড়ি। নানাবাড়ি বেড়ানো শেষ হলে যাবে কক্সবাজার।

কক্সবাজার কেন?

তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না পাপা! পায়রার কণ্ঠে তীব্র অনুযোগ। আমরা কয়েকদিন আগে কক্সবাজার গিয়েছিলাম না! ঘুমকে আমি কক্সবাজারের গল্প বলেছি।

তারপর?

সমুদ্রের ঢেউ দেখে তারপর আসবে বুঝেছ!

ঘাড় নাড়ি আমি বুঝেছি মা! বুঝেছি।

পায়রা কলম টেবিলের ওপর রেখে বিছানায় হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে এসে আমাকে ডাকছে এসো, আমার সঙ্গে খেলবে।

মা?

বলো।

ঘুম তো বেড়াতে গেছে ভালো কথা। ওকে ডেকে আনা যায় না?

যায়। ফোন করো।

ঘুমকে ফোন করব? বলছে কী মেয়ে! ঘুমের কি কান-মুখ আছে? কথা বলতে পারে?

তাছাড়া ঘুমের টেলিফোন নম্বর কত? রাতদুপুরে মেয়েটি কী সব বলছে! আমি অবাক হয়ে পায়রার দিকে তাকিয়ে আছি। পায়রা আপন মনে খেলছে।

পায়রা?

খেলতে খেলতে আমার দিকে তাকায় কী পাপা?

ঘুমকে যে ফোন করব বাসায় তো টেলিফোন নেই।

কয়েক মুহূর্ত সে ভাবল, চট করে বিছানা থেকে নামে। দাঁড়ায় আমার সামনে, বলে তুমি অপেক্ষা করো আমি আসছি।

ছুটে চলে যায় পাশের ঘরে। আমি হাই তুলি। বিরক্ত লাগছে। ভাবছি আজ আর লিখব না। চোখের মধ্যে ঘুম উম ছড়াচ্ছে। পায়রা দৌড়ে আসে। মুখে এক আকাশ হাসি। হাতে তার খেলনা টেলিফোন সেট। টেবিলের উপর রাখে, নাও ফোন করো।

কানে রিসিভার লাগিয়ে ডায়াল করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করি মা নম্বর কত?

উহ্ পাপা! কী বোকা তুমি? ঘুমের টেলিফোন নাম্বারটাও জানো না! আমার কাছে দাও। পায়রা আমার হাত থেকে টেলিফোন সেটটা প্রায় জোর করে নিয়ে যায়। নিয়েই একের পর এক নম্বর ঘোরাতে থাকে বিরামহীন তার নম্বর ঘোরানো। এবং সে এক সময় ঘুমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারল। সোফায় পা ছড়িয়ে সে বসে এবং ঘুমের সঙ্গে কথা শুরু করে।

হ্যালো ঘুম! তুমি কেমন আছো? ভালো! ভেরি গুড। দুপুরে কী খেয়েছ? কী? আলুভর্তা আর ডিম ভাজা দিয়ে গরম ভাত? ভেরি গুড। আচ্ছা শোনো ঘুম! পাপা রাগ করছে। তুমি চট করে আমার চোখে চলে এসো। কাল সকালে তোমাকে লাল শাড়ি আর বাটাভরা পান দেবো। ঠিক আছে একজোড়া রূপোর মলও দেবো। গুড। ভেরি গুড, চলে এসো ঘুম আমার চোখে, রাখি?

পায়রা ফোনটা রাখে টেবিলের উপর। এবার সত্যি সত্যি হাই তোলে। পাপা আইটটা নিভিয়ে দাও। যে পায়রা এত কথা বলতে পারে সে 'ল' ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে না। লাইটকে বলে আইট। লোককে বলে ওক। লালকে বলে নাল। কী আর করা পায়রার আদেশ অমান্য করতে পারি না। লাইট নিভিয়ে পায়রাকে বুকে নিয়ে বিছানায় গেলাম। দু'জন গলা জড়াজড়ি করে শুয়েছি, কখন যে ঘুমিয়ে গেছি বলতে পারব না।

তবে হ্যাঁ, তোমরা যারা পায়রাকে নিয়ে লেখা 'হ্যালো ঘুম' গল্পটি পড়ছ তারা যদি আলতা পড়া, ঘুঙুর পায়ে, টিকলি মাথায় ঘোমটা দেওয়া দুষ্টু ঘুমকে কোথাও পাও, যে ঘুম আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি গেয়ে গেয়ে পৃথিবীর বাঙালিদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে মুড়ি-মুড়কি খায়, পান চিবিয়ে মুখ টুকটুকে লাল করে ঘুরে বেড়ায় আমাকে খবর দিও, চুপিচুপি। পায়রা যেন জানতে না পারে! কেমন! ❑

শিশুসাহিত্যিক

কবিতায় বৈশাখ

নববর্ষের নতুন স্বপ্ন

শাফিকুর রাহী

বাতাস বানে রবীন্দ্র গান অরুণ আভায় নাচে
বুলবুলি ও টিয়া নাচে বট-শিমুলের গাছে।

নতুন বছর করতে বরণ রমনারই উদ্যানে-
বর্ণ-বিভেদ ভুলে মানুষ ছুটল ভোরবিহানে।

বীর বাঙালির মহোৎসব পহেলা বৈশাখে
বিভেদ ভোলার বাতাস নাচে নানা বৃক্ষশাখে।
নতুনের আনন্দে বুঝি প্রকৃতিও হাসে-
দুধকুমারের জলতরঙ্গে হাওয়ার ভেলা ভাসে!

নাচে গানে বীর তকমায় বীরের মানসমাঠে-
তারুণ্যেরই দীপ্ত প্রভায় জ্ঞানের সুধা পাঠে

আকাশ গাঙে হাওয়ার ভেলায়-তাল পুকুরের ঘাটে
ভালোবাসার শ্যামলিমা-জপি স্বদেশ মাকে।

পুরাতনের দুঃখ ব্যথা সব গ্লানি ভুলে-
গাঁয়ের মানুষ আজও বুঝি হালখাতাও খুলে!

শহর নগর পল্লী গাঁয়েও কী যেন আজ নেই;
খোকা-খুকুর স্বপ্ন-বিরান হারিয়ে ফেলে খেই!

ডাঙ্গুলি আর গোল্লাছুট ও হাডুডু-কাবাডি-
খেলা শেষে উঠোন জুড়ে পেতে শীতল পাটি

রূপকথারই আজব কিচ্ছে শোনায় মা ও মাসি
কোন উদাসীর পারান নাচে দেশকে ভালোবাসি!

কি যে মধুর দিন ছিল এক আমার নিঝুম গাঁয়ে
রং-বেরঙের বসতো মেলা বনারণ্যের ছায়ে-

সকাল-বিকাল সারাবেলা নতুন দিনের গানে
নববর্ষ স্বপ্ন জাগায় সব মানুষের প্রাণে!

হাওয়ার তালে ভোমরা ঘুড়ি দারুণ শব্দে দোলে-
কোন সে কিশোর হারায় ঘুড়ি নীল আকাশের কোলে;

রবির গানে ভাবনা জাগায় সুরের কারুকাজে-
কোন সে নগর কবির প্রাণে সকাল সন্ধ্যা বাজে!

নারকেল আর চিড়া মুড়ি দুধকলাতে নাশতা-
এসব কিছু হারিয়ে গেছে; তোমরা যে খাও পাস্তা!

দিন বদলের শ্লোক বাজে আকাশে-বাতাসে
সেসব স্মৃতি দিচ্ছে নাড়া নতুন বোশেখ মাসে।

বিবর্তনের দমকা হাওয়ায় পালটে গেছে সব
মস্ত বড়ো দালানকোঠা- গোলাপ বেলির টব।

বৈশাখি

বিচিত্র কুমার

ওই বৈশাখি মেয়ে আসে
সবুজ-শ্যামল গাঁয়ে,
কপালে কালো টিপ দেয়
রং মাখে পায়ে।
হাসিখুশি মুখখানা
চোখে কাজল টানা।
ধানকুলা হাতে তার
বাজে ঢাক-ঢোলকে,
মেলা থেকে কিনে আনা
দোলে নাকে নোলকে।
উৎসব ভরা নগরীতে
হলুদ বর্ণ শাড়িতে।

হলুদ পাখি গান গায়
মাতে নববর্ষে,
বরণের ডালাখানি
হাতে নিয়ে হর্ষে।
ওই ছুটে ফুল পাখি
দেখে জুড়াই দুই আঁখি।

নাগরদোলা

সজীব মালাকার

চড়ব আমি নাগরদোলা
বোশেখ মেলায় গিয়ে,
ফিরার সময় ফিরব হাতে
কাঠের পুতুল নিয়ে।

পকেট যদি গরম থাকে
কিনব যে লাল চুড়ি,
রং-বেরঙের মিঠাই নিব
সাথে মোয়া মুড়ি।

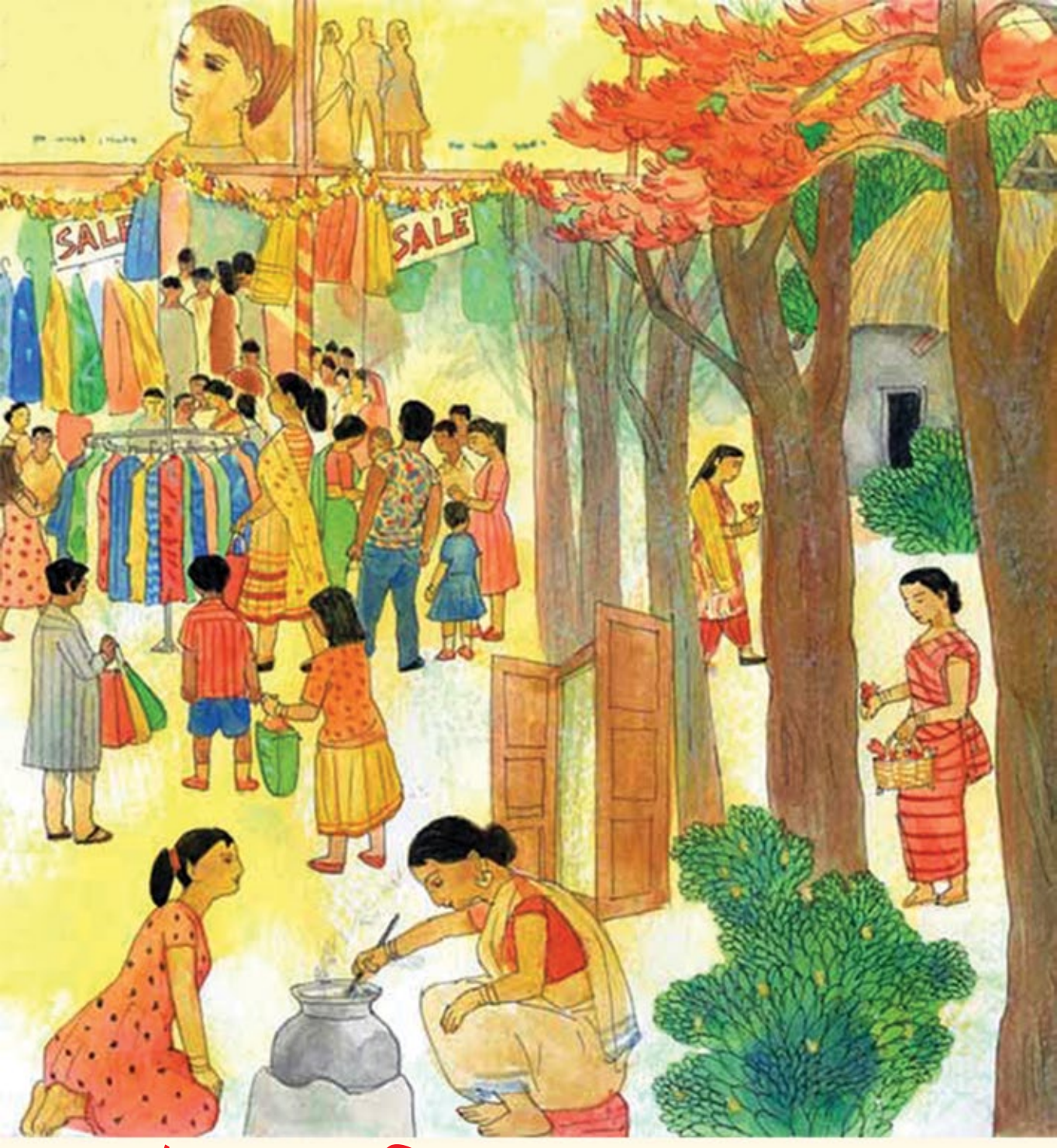

বৈশাখ বাঙালির একটি বাতিঘর

মিনার মনসুর

আমাদের শৈশবে সবচেয়ে বড়ো আনন্দের বার্তাটি নিয়ে আসত পহেলা বৈশাখ। পুরো বৈশাখ মাসজুড়েই ছড়িয়ে থাকত আনন্দের এই ম ম ঘ্রাণ। আনন্দের যে এত রূপ এত বিচিত্র আয়োজন

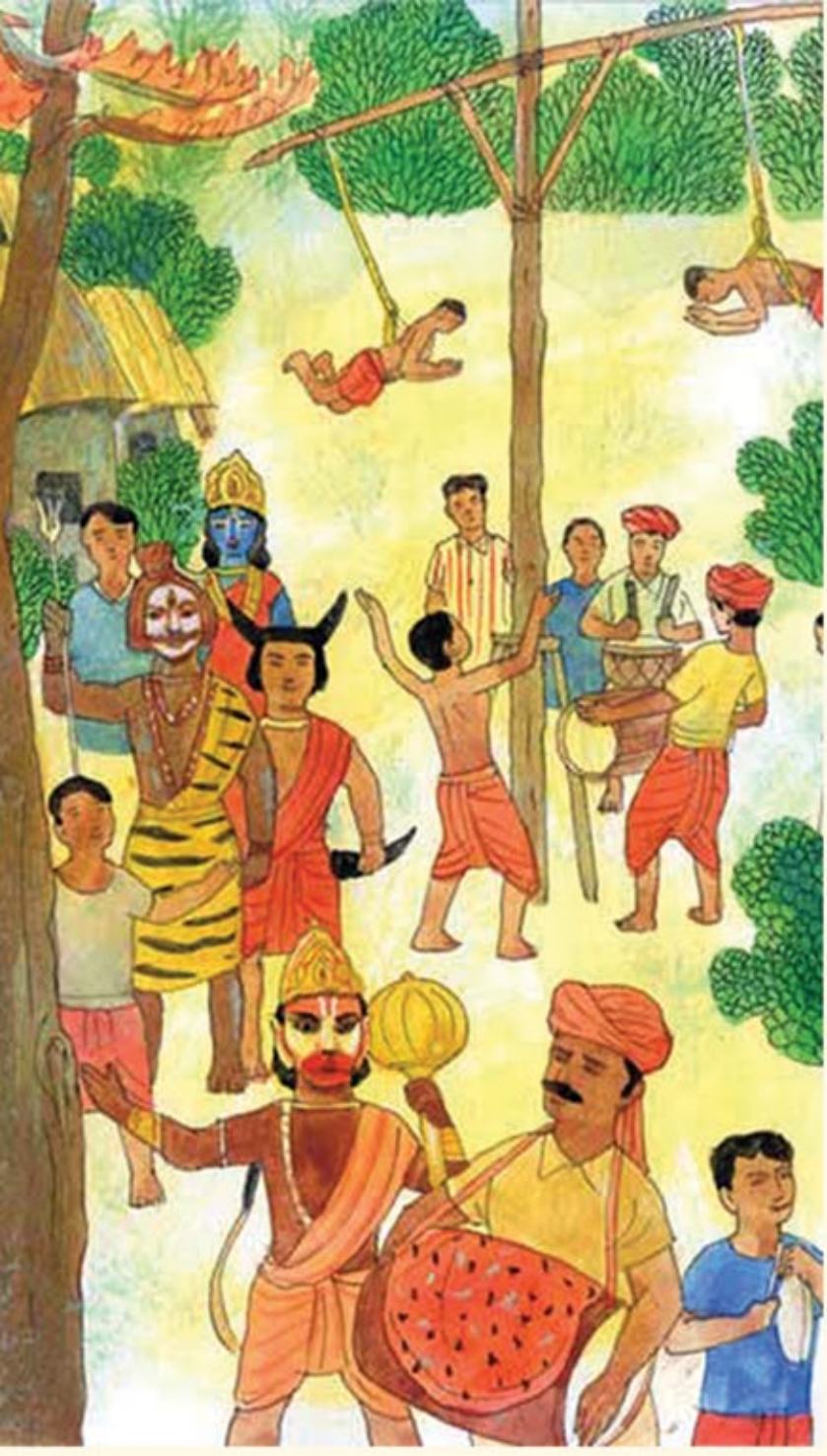

সেটা বৈশাখকে না দেখলে আমাদের শিশুমন হয়ত বুঝতে পারত না কখনো।

তোমরা প্রশ্ন করতে পারো, কী ছিল সেই বৈশাখে? আমি বলব, বৈশাখের ভাণ্ডারে এমন কিছু ছিল যা এখন আমাদের হাতের কাছে দামি দামি আনন্দের যত উপকরণ আছে সবকিছু দিয়েও আর হয়ত ফিরিয়ে আনা যাবে না। এটি যখন ভাবি তখন তোমাদের জন্য, আমাদের সন্তানদের জন্য– খুব মন খারাপ হয়।

বৈশাখ শব্দটি শুনলেই সবার আগে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে। কারণ এই বৈশাখের সঙ্গে আমার মায়ের সুঘ্রাণ জড়িয়ে আছে– যে মাকে আমি আর কখনোই ছুঁতে পারব না। বৈশাখ যে আসছে সেটি আমি বুঝতে পারতাম মায়ের দমবন্ধ করা ব্যস্ততা দেখে।

পহেলা বৈশাখের অন্তত দিনদশেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যেত মায়ের দৌড়ঝাঁপ। এখনকার মায়েদের মতো আমাদের মায়েদের হাতে এত টাকাপয়সা ছিল না। ছিল না যেখানে ইচ্ছে ছুটে যাওয়ার স্বাধীনতাও। তারপরও মা যে যত্ন করে কত কিছু জোগাড় করতেন! নিজের জন্য অবশ্যই নয়– সবই করতেন পরিবারের জন্য, সন্তানদের জন্য।

পুরো বাড়ি ঝকঝকে তকতকে করে রাখতেন। দরজায় ঝুলিয়ে দিতেন পাতাসুদ্ধ নিমের ডাল। নাকে লেগে থাকত ধূপ-আগরবাতির বিচিত্র সুঘ্রাণ। সবচেয়ে বড়ো আয়োজনটি ছিল খাবারদাবারের। বাজারে যত শাকসবজি, মাছ পাওয়া যেত তার প্রায় সবই তিনি সংগ্রহ করতেন বৈশাখের প্রথম দিনটিকে উদযাপন করার জন্য। সাথে থাকত ঘরে বানানো দই, ফিরনি, পায়েস। মোয়া-মুড়ি-বাতাসা তো থাকতই। সেকালে অতি দুর্লভ নিমকি-রসগোল্লাও জুটে যেত কদাচিৎ।

তিনদিন আগে থেকেই মা আদেশ জারি করতেন, পহেলা বৈশাখের সকালে ও দুপুরে বাইরে খাওয়া

যাবে না। ঘরেই হবে সব আয়োজন। এসব নিয়ে আমার কৌতূহলের কোনো শেষ ছিল না। বৈশাখের আগেই কেন ঘরবাড়ি পরিষ্কার করতে হবে? দরজায় কেন ঝুলবে নিমের ডাল? কেন এত রকম রান্নাবান্না? আর পহেলা বৈশাখে বাইরে খেলেই বা কী দোষ?

ঈশ্বরী পাটুনির মতোই মায়ের উত্তরটি ছিল খুব সরল ও সাদামাটা। সেটি হলো– 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। কোনো অমঙ্গল যেন ছুঁতে না পারে তাঁর সন্তানকে। সে জন্যই এত এত আয়োজন। ঈশ্বরী পাটুনির গল্পটি তোমাদের জানার কথা নয়। তবে গল্পটি অবশ্যই তোমাদের শোনা দরকার।

দরিদ্র মাঝি ঈশ্বরী পাটুনির সঙ্গে দেবী অন্নপূর্ণার দেখা হয়েছিল দৈবক্রমে। তাঁকে নদী পার করে দিয়েছিলেন তিনি। দেবী তাঁর ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন যে তুমি যা ইচ্ছে চাইতে পারো আমার কাছে। আজকের প্রজন্মের হয়ত বিশ্বাসই হবে না যে ঈশ্বরী পাটুনি ধনদৌলত, পদ পদবী, রাজ্য বা রাজপ্রাসাদ কিছুই না চেয়ে দেবীর কাছে একমাত্র যে প্রার্থনাটি করেছিলেন সেটি হলো, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০) আজ থেকে প্রায় তিনশ বছর আগে এ কাহিনি লিখে গেছেন তাঁর বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে।

তখন বুঝিনি, এখন বুঝি, সবকিছুর মূলে ছিল এক মঙ্গলচেতনা। আর বৈশাখের সঙ্গে ছিল তাঁর নাড়ির সম্পর্ক। অর্থাৎ বৈশাখ ও বাঙালির মঙ্গলবোধ তারা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। বস্তুত সব বালামুছিবত থেকে সন্তানকে সুরক্ষার জন্যই বৈশাখ আসার আগেই মা ঘরবাড়ি সব ঝকঝকে তকতকে করে রাখতেন। জ্বালাতেন ধূপ-আগরবাতি। দরজায় ঝুলিয়ে রাখতেন নিমের পাতাসুদ্ধ ডাল। এ সময় ঘরে ঘরে তখন জলবসন্ত হতো। হতো ডায়রিয়া-ম্যালেরিয়াসহ আরো নানা রোগব্যাধি। আমাদের ছোটোবেলায় গুটিবসন্তে পাড়াসুদ্ধ উজাড় হয়ে যেতে দেখেছি।

দিন বদলে গেছে। কিন্তু মাত্র কদিন আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সন্তান আক্রান্ত হয়েছে জলবসন্তে। চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিকের পাশাপাশি আমরা তাকে প্রতিদিন নিমপাতা সিদ্ধ জলে স্নান করিয়েছি। এ সময় মশাসহ নানা পোকামাকড়েরও উৎপাত বেড়ে যায়। মশা প্রতিরোধে এখনো অনেকে ধূপের ধোঁয়া ব্যবহার করে থাকেন। আমাদের বাঙালি মায়েরা বংশপরম্পরায় অতি মূল্যবান এসব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করেছিলেন।

বৈশাখের সকালটা ছিল উৎসবের মতো। আমরা নতুন জামাকাপড় পেতাম। পেতাম আকর্ষণীয় সেলামিও। সেলামির বিষয়টি পরে ব্যাখ্যা করব। খাবারের বিবরণটাই আগে দিই। সকাল শুরু হতো পিঠা-পুলি-পায়েসসহ হরেক রকম খাবার দিয়ে। তার আগেই মা দোয়া পড়া পানি ছিটিয়ে দিতেন আমাদের সারা শরীরে। শুনেছি এ পানিও বিশেষভাবে সংগ্রহ করা হতো।

দুপুরের আয়োজনটিই হতো দেখার মতো। হরেক রকমের শাকসবজি, ভর্তা, মাছ ও মিষ্টিজাতীয় খাবারের মহাসমারোহে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের চিরাচরিত চেহারাটাই বদলে যেত। খাবারের পদ বা আইটেম এত বেশি হতো যে মাটিতে মাদুর বিছিয়ে আমরা খেতে বসতাম। মা আমাদের সব খাবারই অল্প করে হলেও খেতে বাধ্য করতেন। সর্বোপরি, শুরু করতে হতো তিতা করলা বা তেতো স্বাদের কোনো শাক বা সবজি দিয়ে।

মা-ন্যাওটা হিসেবে আমার খ্যাতি ছিল। আমি নাছোড়বান্দার মতো মাকে প্রশ্ন করতাম, কেন আমাদের এতসব খেতে হবে? মা বলতেন, 'তোরা যেন সারা বছরই এভাবে তৃপ্তিসহকারে সব ধরনের খাবার খেতে পারিস সেইজন্যই বছরের প্রথম দিনে এই আয়োজন। এটা আমাদের মা-নানিরাও করেছে। আমিও করি।' জিজ্ঞেস করতাম, সেটা না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু তেতো শাকসবজি কেন খেতে হবে? মা বলতেন, এটা হলো মহৌষধ। এতে রোগবালাই দূরে থাকে।

এবার সেলামি প্রসঙ্গে আসি। আমি চট্টগ্রামের সন্তান। পুরো বৈশাখ মাসজুড়েই সারা চট্টগ্রামে মেলা হতো। এসব মেলার যে কী আনন্দ তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তবে সব মেলাকে ছাপিয়ে যেত চট্টগ্রামের লালদিঘির মাঠে ঐতিহাসিক জব্বারের বলীখেলাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত মেলাটি। এ মেলাকে ঘিরে আনন্দের ঝড় বয়ে যেত সারা শহরে। কালবৈশাখির ঝড়ো হাওয়াও হার মানত তার কাছে।

পহেলা বৈশাখে যে উৎসবের সূচনা হতো তা শিখরে পৌঁছে যেত এ মেলায়। মেলাটি শুরু হতো বৈশাখের দ্বিতীয় সপ্তাহে। কিন্তু তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেত বহু আগেই। সারা দেশ থেকে সব ধরনের লোকজ শিল্পীরা তাদের হাতে তৈরি পণ্যসম্ভার নিয়ে ছুটে আসতেন এই মেলায়। এমনকি কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত সেরা সবজিরও পসরা সাজিয়ে বসতেন। এই মেলায় একটি বিশালাকার তরমুজ আমি চারজন লোককে বহন করতে দেখেছি। সেই সঙ্গে বলীখেলাসহ নানা ধরনের লোকজ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা তো ছিলই। কোতোয়ালি থেকে আন্দরকিল্লা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই মেলার পরিসর।

এ মেলার একটি বড়ো আকর্ষণ ছিল সেলামি। কাছের-দূরের নির্বিশেষে বড়োরা ছোটোদের সেলামি দিতেন মেলা উপলক্ষ্যে। ঈদেও আমরা সেলামি পেতাম। কিন্তু এ সেলামির কাছে সেটা কিছুই নয়। মা একাই দিতেন শতাধিক টাকা। তখন ছিল এক পয়সায় দুটি লাঠি লজেন্স বা একটি মালাই আইসক্রিম কিনে খাওয়ার যুগ। পকেটভর্তি টাকা দিয়ে আমরা মনের আনন্দে যা ইচ্ছে খেতাম। কেনাকাটা করতাম। আর সারাদিন সারা মেলা চষে ঘরে ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে আসতাম চনামনার ট্যাং, টমটম গাড়ি, আরও কত কী!

চট্টগ্রামের পটিয়ায় যেখানে আমাদের গ্রামের বাড়ি তার একপাশে ছিল হিন্দুপাড়া। অন্যপাশে বৃহৎ বৌদ্ধপাড়া। আর মাঝখানে ছিল বৈষ্ণব ও যোগী সম্প্রদায়ের বসবাস। শত শত বছর ধরে তারা পাশাপাশি বসবাস করে আসলেও কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা কখনো শোনা যায়নি। নানা ধর্মের মানুষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এমন উত্তম উদাহরণ আর কী হতে পারে!

দুই ঈদের ছুটিতে আমরা ছুটে যেতাম গ্রামের বাড়িতে। তবে পহেলা বৈশাখের আকর্ষণের সঙ্গে অন্য কোনো কিছুরই তুলনা চলে না। মূল আকর্ষণ ছিল দুটি। প্রথমত, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তাদের উৎসব-আনন্দে শরিক হওয়া। আর দ্বিতীয়টি হলো গ্রামীণ মেলা। মাকে কোনোমতে তুষ্ট করেই আমরা ছুটে যেতাম হিন্দু পাড়ায়। পহেলা বৈশাখকে ঘিরে সেখানে ঘরে ঘরে চলত উৎসব। আর সেই উৎসবের একটা বাড়তি আকর্ষণ ছিল নানারকম উপাদেয় খাবার। লোকজ নাচগান ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বরণ করা হতো নতুন বছরকে।

বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে শহর ও গ্রাম নির্বিশেষে সব ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার বাছবিচার ছাড়াই সবাইকে মিষ্টিমুখ করা হতো। এখানে ধর্মের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। আমরা দুপুর থেকে রাত অবধি সারা শহর কিংবা গ্রাম ঘুরে ভরপেট খেয়ে ঘরে ফিরতাম। মা সবই জানতেন। বুঝতেন। কিন্তু কখনোই এ নিয়ে একটি কটুবাক্য বলেছেন বলে মনে পড়ে না। মা নিজে খুব ধার্মিক ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। কোরান তিলাওয়াত করতেন নিয়মিত। কিন্তু কোনো দিন অন্য ধর্মের কারো প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ পোষণ করতে দেখিনি তাঁকে।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে গেল, শহরে দীর্ঘদিন আমাদের প্রতিবেশী ছিল একটি বৌদ্ধ পরিবার। তারা আমাদের বাসায় ভাড়া থাকতেন। মহামতি বুদ্ধের অনুশাসন মেনে চলতেন অক্ষরে অক্ষরে। বেশিরভাগ সময় শাকান্ন খেয়েই কাটাতেন। কিন্তু কত বৈশাখে যে এই বাসায় আমরা খেয়েছি তা ভেবে এখন বুকটা হু হু করছে। বেশির ভাগ সময়ে আমার মাও তাতে অংশ নিতেন বিনা দ্বিধায়। সেই শৈশবেই একটা বিষয় আমি দেখেছি এবং শিখেছি যে ধর্ম ভিন্ন হলেও বাঙালির জীবনাচরণ বা সংস্কৃতি প্রায় অভিন্ন। পহেলা বৈশাখ এলেই সেটা আমরা আরো বেশি করে বুঝতে পারতাম। নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে যত মতবিরোধই থাকুক বৈশাখ তার বিনিসুতোর মালায় গেঁথে আমাদের এক ও একাকার করে ফেলত।

বাঙালি মুসলমানের নিজস্ব উৎসব আছে। বাঙালি হিন্দুর নিজস্ব উৎসব আছে। বাঙালি বৌদ্ধের আছে। আছে বাঙালি খ্রিস্টানেরও। কিন্তু যদি প্রশ্ন করি, সকল বাঙালির অভিন্ন কোনো উৎসব কী আছে? আমরা বুক ফুলিয়ে আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি: অবশ্যই আছে। আর সেটি হলো– পহেলা বৈশাখ। এজন্যই বাঙালির জীবনে বৈশাখের আলাদা একটি গুরুত্ব আছে। যখনই সাম্প্রদায়িকভাবে বা অন্য কোনো অপকৌশলে বাঙালির মধ্যে কেউ বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছে তখনই বৈশাখের বর্ম দিয়ে বাঙালি তা প্রতিহত করেছে।

বৈশাখ হলো বাঙালির এমন একটি বাতিঘর– যা কখনোই নির্বাপিত হয় না। ❑

একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক, পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

গল্প

আমি একটা শুকনা পাতা

তারিক মনজুর

যখন ঝড় শুরু হলো, তখন আমি গিয়ে পড়লাম তিলার মাথায়। ওর নাম যে তিলা, সেটা তখনো জানতাম না। তবে এটা বুঝতে পারছিলাম, মেয়েটা বেশ চটপটে। সে দ্রুত দুই হাত দিয়ে আম কুড়িয়ে ঝুড়ির মধ্যে রাখছিল। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন ছিল। ওদের নাম অবশ্য আমি জানতে পারিনি।

আসলে তখন কেউ কারো নাম ধরে ডাকছিল না। সবাই ব্যস্ত ছিল আম কুড়াতে। আমার মতো আরো অনেক শুকনা পাতা এখানে-সেখানে উড়ে উড়ে পড়ছিল। কিন্তু কেউ সেদিকে নজর দিচ্ছিল না।

আমি এর আগেও ঝড় দেখেছি। তবে সেটা গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে। ঝড় শুরু হলে আমাদের পাতাদের নাচ শুরু হয়ে যেত। বিশেষ করে শুকনা পাতারা খুব নাচত। ঝড়ের সময় শুকনা পাতাদের মনে খুব আনন্দ হতো। কারণ, একটু পরেই বাইরের পৃথিবী দেখার সুযোগ হবে!

আমি ঝড়ের মধ্যে এর আগেও নাচানাচি করেছি। তবে ডাল থেকে খসে পড়িনি। কারণ, তখন আমি ছিলাম কাঁচা। আর শরীর ছিল ভারী। নাচলেও নাচটা ঠিকমতো হতো না। এবার ঝড়ের কদিন আগে আমি শুকিয়ে হালকা হয়ে গিয়েছিলাম। একটু বাতাস হলেই অনেক দুলতাম। তাই অপেক্ষা করছিলাম কবে প্রবল একটা ঝড় শুরু হবে।

সেই ঝড় শুরু হলো। প্রথমে হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে এল। তারপর এলোমেলো বাতাস শুরু হলো। গাছ থেকে টুপটাপ করে আম পড়তে লাগল। আর তিলারাও আমাদের গাছের নিচে চলে এল। আম আর পাতা পড়ার ফাঁকে আমিও এক সময়ে খসে পড়লাম। মাটিতেই হয়ত পড়তাম। তবে সামনে তিলার মাথা দেখে আমি সেখানেই নামলাম।

তিলার মাথায় প্রজাপতির মতো একটা ক্লিপ ছিল। সেটা দেখেই সেখানে নামতে ইচ্ছা হলো। ভেবেছিলাম, তিলা টের পেয়ে আমাকে হয়ত ওর মাথা থেকে ফেলে দেবে। কিন্তু আমার দিকে তিলা বা ওর বান্ধবীদের একটুও নজর ছিল না। আমি প্রজাপতির মতো ক্লিপটার সাথে নিজের হাতটাকে পেঁচিয়ে নিলাম।

বাতাসের কারণে মনে হচ্ছিল, এভাবে হয়ত বেশিক্ষণ তিলার মাথায় থাকতে পারব না। কিন্তু আমার ভিতরেও জিদ কাজ করছিল। ভাবলাম, একটু চেষ্টা করে দেখিই না!

ঝড়ের সাথে সাথে এবার দু-এক ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল বৃষ্টিতে ভিজি। কিন্তু তিলার মা জোরে ডাক দিলেন, 'তিলা! ঘরে ঢুকে পড়ো! বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা! তিলা বা তিলার সাথের কেউ একবারও সেদিকে তাকালো না। তিলার মা দরজায় দাঁড়িয়ে আবার ডাকলেন। এবার তিলা তার মায়ের দিকে একবার তাকালো। 'এখন না, মা!' এই বলে সে আবার আম কুড়াতে লাগল। তখনই বুঝলাম, এই মেয়েটার নাম তিলা।

'দাঁড়াও, আমি বললে তো কাজ হবে না! তোমার

বাবাকে ডাকছি।' বলে তিলার মা ঘরে ঢুকে গেলেন।

তিলার বাবা এলে কী হবে, আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। আপাতত মনে হলো, মাথায় থাকা নিরাপদ হবে না। তাই মাথা থেকে টুপ করে ঝুড়ির মধ্যে নামলাম। এতক্ষণে খেয়াল করলাম, ঝুড়ির ভিতরে অনেক আম জমা হয়েছে। সবই কাঁচা আম।

একটু পরে তিলার বাবা এসে ডাক দিলেন, 'তিলা! ঝড়ে ডাল ভেঙে মাথার উপর পড়তে পারে! তোমার বান্ধবীদের নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ো।'

তিলার বাবার কথা শুনে বুঝলাম এরা তিলার বান্ধবী। তারা তিলার বাবার কথা শুনে ঘরের ভিতর চলে এল। তিলাও তাদের পিছন পিছন ঘরে ঢুকল। এর পরপরই টুপটাপ বৃষ্টি ঝমঝম করে নামল।

তিলার বাবা বাগানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমের ঝুড়িটা বুঝি আমাকেই আনতে হবে!' এই বলে তিনি বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়লেন। আমগাছের নিচ থেকে ঝুড়িটা দুই হাতে শক্ত করে ধরে উঁচু করলেন। তারপর সেটা নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। আমিও ঝুড়ির আমগুলোর সাথে ঘরের ভিতরে ঢুকলাম।

বাব্বাহ্! একটা ঘরের ভিতরে এত কিছু থাকে! আমি তিলাদের ঘরে ঢোকার পর চোখ বড়ো বড়ো করে সবকিছু দেখতে লাগলাম।

তিলার বাবা ঝুড়িটা তিলার মায়ের কাছে রেখে বললেন, 'নাহ্, একেবারে ভিজে গেছি। গোসল করতে হবে।' এই বলে তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন। আমার খুব মজা লাগল ঘরের ভিতরে গোসল করার ব্যবস্থা আছে শুনে। কারণ, গোসল করার জন্য আমাদের ঘর লাগে না। বৃষ্টি হলেই আমাদের গোসল হয়ে যায়।

তিলার মা একটা তোয়ালে এনে তিলার আর তিলার বান্ধবীদের মাথা মুছে দিতে লাগলেন। তখন বুঝলাম, এই মেয়েগুলো তিলার সাথে একই স্কুলে পড়ে। মানুষেরা যে পড়াশোনা করে, এটা আমি আগে থেকেই জানি। আমাদের গাছে একটা পাখি প্রতিদিন আসে। সেই আমাকে বলেছে, মানুষের বাচ্চারা অ-আ-ক-খ

শেখে। অ-তে অজগর হয়। আ-তে হয় আম। অ দিয়ে পাতা কিংবা আ দিয়ে পাতা কেন হয় না, এটা আমি পাখিটাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু সে কোনো উত্তর দিতে পারেনি।

তিলার মা একটু পরে ঝুড়ির সব আম ঘরের মেঝেতে ঢাললেন। তারপর সেগুলো থেকে কয়েকটা তুলে বললেন, 'দাঁড়াও, এগুলো লবণ-মরিচ দিয়ে ভর্তা বানিয়ে দিই।' শুনে আমার ভয় লাগল। আমাকেও যদি এখন ভর্তা বানায়, তবে আমার শুকনা শরীর মুড়মুড় করে ভেঙে যাবে। তিলার মা আমাকে হাতেও তুলে নিলেন। বললেন, 'এই পাতাটা আবার আসলো কোত্থেকে?'

তার কথার মধ্যে তাচ্ছিল্য আছে, এটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। তিনি ছুড়ে দরজা দিয়ে বাইরে ফেলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাইরের জোরালো হাওয়ায় আমি আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। তিলা আমাকে আলতোভাবে হাতে তুলে নিল। তার বান্ধবীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পাতাটা খুব সুন্দর। তাই না?'

ওর বান্ধবীরা অবশ্য আমার দিকে বিশেষ নজর দিল না। তারা আলাপ করতে লাগল আম ভর্তা নিয়ে। কাঁচা আমের ভর্তা খেতে কত মজা, সেটা নিয়েই ওরা কথা বলছিল।

একটু পরে টেবিলে এক গামলা আম ভর্তা নিয়ে তিলার মা হাজির। আর সবাই হাপুস হুপুস করে সেই গামলা থেকে আম ভর্তা নিয়ে খেতে থাকল। আমের টকে ওদের চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। আর তাদের জিভের লালাও পানির মতো হয়ে যাচ্ছিল। তিলা এক হাত দিয়ে আম ভর্তা খাচ্ছিল, আর অন্য হাতে আমাকে ধরে রেখেছিল।

তিলার বাবা গোসল করে এ ঘরে আসতেই তিলা বলল, 'বাবা, আমপাতাটা সুন্দর না!'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর!' বাবা সায় দিলেন।

কিন্তু মা ফোড়ন কেটে বললেন, 'হ্যাঁ, খুব সুন্দর! এখন এটাকে পড়ার টেবিলে সুতা দিয়ে বেঁধে রাখো!'

তিলার মা মজা করে কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু তিলা সত্যি সত্যি আমাকে সুতা দিয়ে বেঁধে জানালায় ঝুলিয়ে রাখবে বুঝতে পারিনি।

কয়েকদিন আমি সেই জানালায় থাকলাম। জানালা দিয়ে ঘরের বাইরের আমগাছটা দেখতে পেতাম। সেখানে আরো অনেক শুকনা পাতা বাইরের পৃথিবী দেখার অপেক্ষায় ছিল।

তারপর একদিন আমি মুড়মুড় করে ভেঙে পড়লাম। একজন আমি অনেক আমি হয়ে গেলাম। তিলার মা ঘর ঝাড়ু দিয়ে আমাদেরকে বাইরে ফেলে দিলেন।

বাইরের মাটিতে নতুন নতুন আরো অনেক চারা বড়ো হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। হাওয়ার গাড়িতে চড়ে আমরা একেক জন একেকটা গাছের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলাম। আমরা ঠিক করলাম, মাটিতে মিশে ওই চারাগুলোর বড়ো হওয়া দেখব। ❑

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কবিতায় বৈশাখ

বৈশাখি ভর্তা

মিজানুর রহমান মিথুন

ভর্তা খাবে ভর্তা?
বৈশাখি ভর্তা,
বানিয়েছেন বাড়ির কর্তা।
পাটা পুতোয় পিষে পিষে
বানিয়েছেন এক নিমেষে
মুখে দিলেই যাবে মিশে।
কমলা রঙের হলদে রঙের
আরো নানান রকম ঢঙের।
শুঁটকি মাছের মুটকি মাছের
ইলিশ মাছের, নানান রকম ভেষজ গাছের
সাথে আছে আরো মজার সরষে মরিচ ভর্তা।
খাচ্ছে দিদি ঠাকুর দাদা
খাচ্ছে মেজো কর্তা
খেয়ে বেহুশ আজকে সবাই বৈশাখি ঝাল ভর্তা।

বর্ষ শুরু

আবদুল হামিদ মাহবুব

চৈত্র শেষে
বৃষ্টি হলো
জল ধুয়েছে ময়লা,
বোশেখ এল
বর্ষ শুরু
আজ বোশেখের পয়লা।

জীর্ণ গ্লানি
সব কালিমা
করেই পরিষ্কার,
যত বিভেদ
বিবাদ আছে
চাই সমাধান তার।

এল বৈশাখ

তোফাজ্জল হোসেন তালুকদার

বছর ঘুরে এল পহেলা বৈশাখ
বাঙালির ঘরে ঘরে নববর্ষের সাজ

পান্তা, ইলিশ, পিঠাপুলি খেয়ে বৈশাখি মেলায়
আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে মঙ্গল শোভা যাত্রায়

হালখাতার আমেজে ভরে উঠে হাটের দোকান
সবাই মিলে গাইছে সাম্যেরই জয়গান ।

এসো সবাই ভুলে যাই জাতি বর্ণতার বিদ্বেষ
মিলে মিশে থাকব সারা বছর বেশ।

বোশেখ এল

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

নতুন বছর নতুন বেশে
বোশেখ এল ভাই,
খুশির আমেজ করছে বিরাজ
ঘরে ঘরে তাই।

বিন্নি খইয়ের আনন্দটা
নাড়ছে কড়া দোরে,
ফল-ফলাদির রসে মেখে
খাব মজা করে।

গল্প

বায়জিদের দেখা বৈশাখি মেলা

দুখু বাঙাল

বায়জিদের দাদার বাড়ি গ্রামে হলেও তার জন্ম শহরে। বাবা ঢাকায় চাকরি করেন। তার লেখাপড়াও ঢাকার মিরপুরের একটি স্কুলে। কয়েক বছর সে মা-বাবা ও বড়ো বোন শেফালির সঙ্গে ঈদের সময় গ্রামে বেড়াতে আসে। খুব সুন্দর তাদের গ্রাম! গ্রামের নাম বড়ো ডালিমা, পাশেই ইলশে নদী। নদীটির নামও সুন্দর, তাই না? গেল বছর থেকে সে বায়না ধরে বসে আছে– আগামী নববর্ষে তাকে গ্রামে নিয়ে যেতে হবে। এপ্রিলে স্কুলে ছুটি হয় না, মা-বাবা এই অজুহাত তুলে ধরলে বায়জিদ জেদ ধরে। প্রয়োজনে এবার সে ফার্স্টবয় শামীমকে পেছনে ফেলে ক্লাসে দ্বিতীয় থেকে প্রথম হবে। মা-বুকে চেপে ধরে বলেন– আমার লক্ষ্মীসোনা, এবার তোমাকে বাংলা নববর্ষে গ্রামে নিয়ে যাব। বাবাও সায় দেন। শেফালিও খুশি, চাচাতো ভাইবোনদের সঙ্গে আম কুড়োবার ধুম পড়বে।

বায়জিদ এবার ফাইভে আর শেফালি সেভেনে। মার্চ মাস শেষ হতেই দুই ভাইবোন দেয়ালের ক্যালেন্ডারে দাগ কাটতে শুরু করে। পয়লা বৈশাখ দিনটা আসে এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখ। ১২ তারিখ তারা সদরঘাট থেকে লঞ্চযোগে রওনা হয়ে যাবে দাদার বাড়ি পটুয়াখালীর গ্রামে। তাদের আর তর সইছে না। পিচ্চি বয়স থেকেই তারা মা-বাবার মুখে শুনে আসছে বৈশাখি মেলার গল্প। মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়– ডাকাতের মতো হইচই করে আসত বৈশাখে। ধুম পড়ে যেত আম কুড়োবার। কৃষি পরিবারগুলোয় শুরু

হয়ে যেত গরু দিয়ে হালচাষ। তখনো কলের লাঙল আসেনি। স্থানীয় হাটবাজারের দোকানে দোকানে বসে যেত হালখাতা। গ্রামের বিশাল মাঠে বসত মেলা। স্থানীয়ভাবে এই মেলাকে বলা হয় থৌল। বৈশাখি মেলাকে আবার ঘোড়দৌড়ের মেলাও বলা হয়। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড– এই তিনটি ঘোড়াকে পুরস্কৃত করা হতো ঝকঝকে পিতলের ছোটো-বড়ো-মাঝারি কলসি দিয়ে। দৌড়ে অংশ নেওয়া অন্য ঘোড়াগুলোকেও দেওয়া হতো সান্ত্বনা পুরস্কার। ঘোড়দৌড় ছাড়াও মেলায় চলত ষাঁড়ের লড়াই, বাঁদর খেলা, সাপ-বেজির খেলা এইসব।

নববর্ষের একদিন আগেই বায়জিদরা চলে এসেছে গ্রামের বাড়িতে। চাচাতো ভাইবোন ছাড়াও পাশের বাড়ির গনেশ, তাপস, বীথি, পারভেজ, সেলিম– ওরাও মিলেছে তার সঙ্গে। তাদের দিন শুরু হয় পান্তা আর বিভিন্ন ধরনের ভর্তা ও ইলিশ ভাজা দিয়ে সকালের খাবার গ্রহণের মাধ্যমে। পাশের নদীর কাগজি নাম তেঁতুলিয়া হলেও এর আদুরে নাম ইলশে নদী। এই নদীতে প্রাচীনকাল থেকে প্রচুর ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। সকাল হতেই লোক সমাগম ঘটতে থাকে বড়ো ডালিমা গ্রামের বিশাল মাঠে। কারুশিল্পীরা নিজেদের হাতে তৈরি বিভিন্ন শিল্পকর্ম নিয়ে হাজির মেলায়। মাটির পুতুল, হাঁড়ি, ঘোড়া, লক্ষ্মীর সরা, বাঁশিসহ কতকিছু যে আসে মেলায়। এছাড়া শোলা ও বাঁশের তৈরি বিভিন্ন ধরনের পাটি, গুল্মজাতীয় মুরতা গাছের ছাল দিয়ে তৈরি করা বাংলার ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটি, তালপাতা ও বাঁশের হাতপাখা তো আছেই। মুড়িমুড়কি, বাতাসা, নাড়ু, জিলাপি, রসগোল্লা, বাঙ্গি-তরমুজও এসেছে মেলায়।

ঘরগৃহস্থালির আসবাবপত্রও আছে এখানে। নাগরদোলা আর পুতুলনাচ তো আছেই। নাগরদোলা থেকে নামার পর বায়জিদের মনে হতে থাকল দুনিয়াটা বনবন করে ঘুরছে। ভেংচিকাটা বানরের নাচ দেখে বায়জিদ ও তার বন্ধুরা তো হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাওয়ার উপক্রম। মাঠের একদিকের অনেক এলাকা জুড়ে চলছে কয়েক দলের হাডুডু খেলা। পশ্চিম দিকটায় কেউ গেয়ে চলেছেন ভাটিয়ালি, কেউ বা মুর্শিদি। একদল বাউল একতারা বাজিয়ে গলায় তুলেছেন লালন গীতি। কেউ আবার মত্ত কীর্তন অথবা বৃষ্টির গানে। তার বাবা ময়রার দোকান থেকে বায়জিদ ও তার বন্ধুদের রসগোল্লা ও অন্যান্য খাবার কিনে খাওয়ান। শেফালির ফিতা ও মাটির ভাঁড়সহ বাড়ির সকলের জন্য এটা-ওটা কতকিছু কেনে তারা। সে একবার বাবার সঙ্গে রমনার বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। শহরের চেয়ে গ্রামের অনুষ্ঠান কত সুন্দর, কত বিস্তৃত! গ্রামের বৈশাখি মেলা মানে মহা ধুমধাম– এলাহি কারবার।

মেলার বিভিন্ন জায়গায় বসেছে চা-কফির দোকান। একপাশে মোবাইল সিম, চার্জার ব্যাটারিসহ মোবাইল বাজার। বাজারটা অতিক্রম করার সময় বায়জিদের বাবা বললেন– জানো, আমাদের ছেলেবেলায় এগুলো ছিল না। এখন আছে। তাদের ছেলেবেলায় প্লাস্টিকের কোনোও খেলনা বা জিনিস ছিল না। এখন সব ধরনের প্লাস্টিকের খেলনা ও অন্যান্য মালামাল আসে মেলায়। একপর্যায়ে বায়জিদ বাবার কাছে জানতে চায়, এই মেলা কবে থেকে শুরু হয়েছে। তার বাবা বলেন, বহুকাল থেকেই বাঙালি জাতির আনন্দ উৎসবের বিশাল অনুসঙ্গ হয়ে আসছে এই মেলা। তিনি আরো বলেন, সম্রাট আকবরের মসনদলাভের (১৫৫৬ খ্রি.) অন্তত অর্ধশত বছর পূর্ব থেকে বঙ্গদেশে বাংলা সন সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে প্রজাহিতৈষী সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) আমল থেকে। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে বাংলা সন চালু করেন তিনি। পরবর্তীতে দিল্লির বাদশা জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) তাঁর মসনদ আরোহণের সময় ১৫৫৬ সালের ১১ই এপ্রিল দিল্লির দরবারে ভারতবর্ষের অঞ্চলভিত্তিক প্রচলিত সনগুলোকে সৌর সনে রূপান্তরিত করার নির্দেশ জারী করেন; সেই থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলা সন স্বীকৃত হয়ে আসছে বাংলায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় তখন মল্লাব্দ, শকাব্দ, গুপ্তাব্দ, সেকেন্দার সনসহ অনেক সনের প্রচলন ছিল।

কোনো ভাবেই কোনো মানুষের পক্ষে মেলার সবকিছু দেখা বা উপভোগ করা সম্ভব নয়। বায়জিদ ও তার বন্ধুরা আনন্দচিত্তে কেনাকাটা করা জিনিসপত্র নিয়ে সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরে আসে। মেলায় বায়জিদের বেশি ভালো লেগেছে ঘোড়দৌড়। বিশাল মাঠের উত্তর প্রান্ত থেকে যখন ১০/১২টি ঘোড়া 'অশ্বশক্তিতে' ধুলো উড়িয়ে দক্ষিণ প্রান্তে ছুটে যেতে থাকে, আর দুই ধারের মাঠভর্তি উল্লসিত লোকজন যখন হাততালি দিতে থাকে– তখনকার দৃশ্য খুবই উত্তেজনাকর আর উপভোগ্য। প্রত্যেকটা ঘোড়ার পিঠে আছে লাগাম ধরা একজন করে সহিস। এবারের ঘোড়দৌড়ে দুজন সহিস ছিল তরুণী, যা সকলের নজর কাড়ে। এক তরুণী ঘোড়দৌড়ে সেকেন্ড হয়। পশ্চিম পাড়ার মন্টু নামে মা-হারা এক ছেলে একটা ঘোড়ার আকর্ষণীয় লেজে হাত দিতে গেলে ঘটে বিপত্তি। ফুটবলে হেড করার মতো ঘোড়াটি তাকে এক লাথিতে ছুড়ে দেয় অনেক দূরে। ভাগ্যিস, পাশেই ছিল গ্রামের মৃধাদের বিশাল এক নাড়ার ঢিবি– আর সেখানেই গিয়ে পড়ে সে। চারদিকে পড়ে যায় হইচই আর চেঁচামেচি। মন্টু দুই হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরে থাকে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত ঝরছে। লোকজন মোটর সাইকেলে দ্রুত তাকে বাউফল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সকলের মতো বায়জিদও মন্টুর জন্য কষ্ট অনুভব করে।

রাতে বায়জিদ তার মায়ের কাছে জানতে চায়– আচ্ছা মা, ঈদের সময় শুধু মুসলমান লোকজনই ঈদগাহে নামাজ পড়ে আর কেবল হিন্দুরা তাদের মণ্ডপে পূজা দেয়; এমনটা কেন? সে তার মায়ের কাছ থেকে জানতে পায়, ওগুলো ধর্মীয় উৎসব। ধর্মীয় উৎসবে অনিয়ম করা যায় না। কিন্তু নববর্ষের সার্বজনীন লোকজ মেলা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-মুসলিম সকলের। এ এক অখণ্ড উৎসব– যা মিলনের, যা সম্প্রীতির। বায়জিদ মায়ের কাছে গল্প শুনছে আর মনে মনে ভাবছে– এবার ক্লাসে তাকে ফার্স্ট হতেই হবে। ❑

কবি ও শিশুসাহিত্যিক

রুদ্র তাপে সূর্য যখন মাথার ওপর আসে
গলির পথে লাটিম হাতে বুকখোলা শার্ট হাসে,
খাওয়া ভুলে পিছু ডাক ফেলে লক্ষ্যে অটুট এক
মাঠ পেরুলেই গাঁয়ের মেলা- এসেছে 'বৈশাখ'।

টেপাপুতুল, হাতি, ঘোড়া, ঢোলের গাড়ি, টমটম
পাতার বাঁশি একতারা সুর বাউল গানে গমগম,
'নাগরদোলা' লাটাই বানাই সর্পলেজুর ঘুড়ি
বায়োস্কোপে দু'চোখ রেখে মনাকাশে উড়ি।

ঝুড়ি মুড়ি খই মিষ্টি নিয়ে কেউ ফিরে যায় ঘরে
বেঁচছে যে, সে-ও তাল পাখাতে নিজেই বাতাস করে,
কাঁচের চুড়ি পুতির মালা কারো চোখের নীড়ে
কাজল টানা মৃগয়া চোখ খুঁজল কী তার ভিড়ে!

আসন ভূষণ নানান বরণ ফুল-পাখিতে রাঙালি
ভোজ ভাঁজে ঐতিহ্যে সাজে উদার বাঙালি
হাসি গানে দিন কেটে যাক কাটুক বছর হর্ষে
মঙ্গল দীপ জ্বলে উঠুক এই নববর্ষে।

বিদ্বেষ যত কাঁটা ও ধুলো আছে জীবন পাতায়
ধুঁয়ে মুছে সব নতুন হিসাব শুভ হালখাতায়,
পুতুলনাচ আর যাত্রাপালা দেখবি তোরা কই সব
আয় আঁধারজ্বলা জোনাক হয়ে কাটাই প্রিয় শৈশব।

আনন্দ যাপনের বৈশাখ

ইমরুল ইউসুফ

আজ কাজের কোনো চাপ নেই। স্কুল নেই। পড়া নেই। শুধু খাওয়াদাওয়া আর ঘোরাঘুরি। কারণ আজ বৈশাখ মাসের প্রথম দিন। বাংলা নতুন বছর শুরুর দিন। গায়ে নতুন পোশাক। পোশাকে আবার ঢাকঢোল আঁকা। একতারা, দোতারা, ময়ূর, রাজহংস। সারি সারি পুতুল, নাগরদোলা, বায়োস্কোপ। নতুন পোশাকের ঘ্রাণ। জুড়িয়ে দেয় প্রাণ। প্রাণে আনে শক্তি। মনে আনে গতি। পুষিয়ে নিয়ে ক্ষতি সামনে এগিয়ে যাওয়া। শুধু সামনে। হাঁটতে হাঁটতে মেলায় চলে যাওয়া। মেলায় গিয়ে নাগরদোলা না চড়লে কি হয়? বায়োস্কোপ না দেখলে কি চলে? মুড়ি-মুড়কি না খেলে কি মনে হয় বৈশাখ এসেছে?

ঝড় এসেছে ঝড়। কালবৈশাখি ঝড়। তাতে কী! ঝড় ঠেলেই তো বৈশাখ বরণ করতে হয়। কালবৈশাখি নামটা তো আর এমনি এমনি হয়নি। ক্লান্ত প্রকৃতিকে তো চাঙ্গা করতে হবে। নাড়াতে হবে। জাগাতে হবে। অশুভকে ভাগাতে হবে। কারণ প্রকৃতি জাগলেই তো আমরা জাগব। রাত জেগে যাত্রা, জারি, সারি গান শুনব। পালাগান, শুনব পুঁথিপাঠ। কবির লড়াই। এসবের মাঝেই আমরা খুঁজে পাই আনন্দ। খুঁজে পাই সুখ। নতুন কাজের প্রেরণা। নতুন উদ্দীপনা। জীবনে আসে নতুন স্বাদ। নতুন গতি।

নবান্নের পর আসে বৈশাখ। নতুন চালের ঘ্রাণে, ঢেউ ওঠে প্রাণে। শিল্পীর নিপুণ হাতে তৈরি মাটির পুতুল, তালপাতার পাখা, বাঁশের বাঁশি, পাটের শিকা, শোলার তৈরি পাখি, ঝিনুকের ঝাঁড়, পুঁতির মালা যেন তাদের জীবনে খণ্ড খণ্ড চিত্র। খণ্ড খণ্ড কষ্ট। এই কষ্ট সঙ্গে নিয়েই তারা মেলায় আসেন। বিক্রির আশায়।

নতুন বছর ভালো যাবে সেই আশায়। বসন্তের পর গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ তাদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না। ক্লান্ত করতে পারে না। কারণ তারা সংগ্রামী। তারা লড়তে জানে। শত বাধা অতিক্রম করে নতুন বছরকে বরণ করতে জানে। এতেই সুখ। এতেই আনন্দ। বৈশাখ তাই বাংলার মানুষের জন্য জীবনীশক্তি। মানুষের প্রেরণার উৎস। নবজাগরণের সবাক চলচ্চিত্র। জীবনযাপনের চালচিত্র।

সম্রাট আকবর ও তাঁর প্রচলিত বর্ষপঞ্জি

অতি সহজ-সরল বাংলার মানুষের হৃদয়। এখানে শাস্ত্রীয় সংগীতের কোনো জটিলতা নেই। কৃত্রিমতা নেই। আছে শুধু সহজ-সরল অনুভূতির প্রকাশ। মানুষের ভালোবাসার ছোঁয়া। পুরাতনের সঙ্গে নতুনের সেতুবন্ধ তৈরি করা। বৈশাখ বুঝি এই কাজটিই করে। পুরাতনের সঙ্গে নতুনের সেতু গড়ে দেয়। নতুন গান, নতুন বাণী শুনিয়ে ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগায়। বাঙালিকে উৎসবমুখর করে তোলে। নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। কিন্তু কীভাবে এল পহেলা বৈশাখ? বাংলা নববর্ষ?

সম্রাট আকবর সিংহাসনে বসেন ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে। ভারতবর্ষে তখন ভারত সন, লক্ষ্মণ সন, বিক্রম সন, জালালী সন, সেকান্দার সন, শকাব্দ, গুপ্তাব্দ প্রভৃতি সনের প্রচলন ছিল। যে কারণে যে যার মতো দিন তারিখ বা সন গণনা করত। এজন্য সম্রাটের রাজসভার আমির-ওমরাহরা আকবরের কাছে নতুন সন প্রচলনের আবেদন জানান। তারা ওইসব সনের ত্রুটি বা সমস্যার কথা বলেন। ওইসব সনের কোনোটির গণনা করা হতো সৌর রীতিতে। আবার কোনোটির গণনা করা হতো চান্দ্র মাসের হিসাবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ গণনা করতেন চান্দ্র মাসের হিসাবে। ভারতীয় গণনা রীতি অনুসারে, ১২ চান্দ্র মাসে ধরা হতো ৩৬০টি তিথি। তাই সৌর বছরের সঙ্গে চান্দ্র বছরের গরমিল দেখা দিত প্রতি বছরই। এই গরমিল দূর করার জন্য হিন্দু জ্যোতিষীরা গবেষণা শুরু করলেন। তারা চান্দ্র বছরের হিসাবকে সৌর বছরের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার জন্য প্রতি তিন চান্দ্র বছরে এক মাস অতিরিক্ত যোগ করে নিতেন। এটিকে তারা বলতেন 'মলমাস'। এই

জটিল হিসাবের জন্য প্রজা সাধারণের কাজকর্মে খুব অসুবিধা হতো। যদিও সম্রাটের দরবারে বহুকাল থেকে হিজরি সনের প্রচলন ছিল। কিন্তু হিজরি সন চান্দ্র মাসের হিসাবে চলে। এজন্য বিশেষভাবে একটি সৌর সনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রয়োজন বিবেচনা করে আকবরের নির্দেশে প্রবর্তিত হয় একটি সৌর সন। কোনো কোনো অঞ্চলে এই নতুন সনকে 'ফস্‌লি' সন বলা হতো। আরবি 'ফস্‌ল্' অর্থাৎ শস্যের সঙ্গে শব্দটির মিল থাকায় করা হয় এই নামকরণ। কারণ ফসল ওঠার পর রাজস্ব আদায় হতো এই সন অনুযায়ী। পরে বাংলাদেশে এই সনটি বঙ্গাব্দ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশে সেকালে 'লক্ষ্মন সন' নামক একটি সনও প্রচলিত ছিল। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসন লাভের কাল (১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে এটির গণনা করা হয়। এটির গণনারীতিও ছিল চান্দ্র মাস অনুযায়ী।

এই সৌর সন 'ফস্‌লি' বা 'বঙ্গাব্দে'র ভিত্তি হিসেবে হিজরি সনকে গ্রহণ করা হয় আকবরের সিংহাসন লাভের বছর (১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে। ওই বছর থেকেই হিজরি সনকে সৌর সনে রূপান্তর করা হয়। সম্রাটের নির্দেশে এ-কাজটি করেন আমির ফতুল্লাহ শিরাজী। এজন্য তাঁকে বলা হয় বাংলা সনের উদ্ভাবক। খ্যাতিমান এই জ্যোতির্বিদ সুপণ্ডিতকে তাই বলা হতো পণ্ডিত শিরাজী।

ফতুল্লাহ শিরাজীর বাংলা সন উদ্ভাবনের গল্প বলার আগে বলে নিই বাংলার প্রকৃতি, আবহাওয়া, ঋতুবৈচিত্র্য ও কৃষিকাজের সময়সূচি এখনো বাংলা মাস বা বঙ্গাব্দের সঙ্গে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা যখন রোদ-বৃষ্টি, ঠান্ডা-গরমের কথা বলি তখন 'কালবৈশাখি', 'আষাঢ়ের বর্ষণ', 'শ্রাবণের ধারা', 'ভাদ্রের তালপাকা গরম', 'শরতের মেঘ', 'মাঘ মাসের শীত' কিংবা 'ফাল্গুনের হাওয়া' প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহার করি। এতেই বোঝা যায় বাংলা সন বা সাল আমাদের জীবনে, ঐতিহ্যে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে কীভাবে মিশে আছে। কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে এই যে বাংলা সালের সঙ্গে মিশে যাওয়া, প্রত্যেক বছর ঢাকঢোলা পিটিয়ে বাংলা সনকে স্মরণ করা কে উদ্ভাবন করেছিলেন এমন মধুর বাংলা সনের সেটি জানা দরকার।

আমরা আগেই বলেছি বাংলা সন আবিষ্কার করেন সুপণ্ডিত আমির ফতুল্লাহ শিরাজী। তিনি কীভাবে এই সনের উদ্ভাবন করেছিলেন? আমরা যদি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাই তাহলে ফিরে যেতে হবে ইংরেজি ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে। ওই বছর দিল্লির সিংহাসনে বসেন মুঘল সম্রাট আকবর। তখন আরবি হিজরি সন অনুসারে রাজকার্য চলত। অর্থাৎ রাজ্যের হিসাব-নিকাশ, কর্মচারীদের বেতন, খাজনা আদায় প্রভৃতি কাজ করা হতো হিজরি সন অনুযায়ী। একদিন রাজ্যের হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কয়েক জন সম্রাট আকবরের কাছে গেলেন। বললেন, 'বাদশাহ আমাদের ধর্মকর্ম সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে আরবি অর্থাৎ হিজরি সাল ব্যবহার করতে ইচ্ছে হয় না। তাই আপনি আমাদের একটি পৃথক সাল নির্দিষ্ট করে দিন।' এর কিছুদিন পরেই আবার অসন্তোষ দেখা দিলো সম্রাটের রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে। সম্রাটের কাছে তারা তাদের আবেদনে জানান, 'জাঁহপনা, সৌর পদ্ধতিতে হিজরি সালের কিছু ত্রুটি এবং চান্দ্র সালের কারণে ফসলের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের সময়কাল নির্দিষ্ট রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এমন অবস্থায় আপনি হিজরি এবং চান্দ্র বর্ষের সমন্বয়ে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক নতুন সালের প্রবর্তন করে দিন। যাতে নির্দিষ্ট দিন বা সময়ে আমরা জমির খাজনা পরিশোধ করতে পারি'।

সম্রাট আকবর ছিলেন রাজ্যের সুশাসক এবং ধর্মমতের ব্যাপারে উদার। বিষয়টির গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করলেন। এটি নিয়ে আলাপ করলেন তার সভাসদ আবুল ফজলের সঙ্গে। আবুল ফজলের পরামর্শে সম্রাট কঠিন এই কাজটি সম্পাদনের দায়িত্ব দিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজীর

ওপর। শিরাজী বিষয়টি নিয়ে অনেক গবেষণা করলেন। তারপর হিজরি সালকে অক্ষুণ্ন এবং অপরিবর্তিত রেখে উদ্ভাবন করলেন বাংলা সন। জমা দিলেন সম্রাটের কাছে। সম্রাট আকবর পণ্ডিত শিরাজীর উদ্ভাবিত বাংলা সনকে গ্রহণ করলেন। ওই সময় ইংরেজি সাল ছিল ১৫৫৬। তারিখ ১০/১১ই মার্চ। এখানে উল্লেখ্য, শিরাজীর প্রচেষ্টায় ৯৬৩ হিজরির মুহররম মাসের শুরু থেকে বাংলা বর্ষের অর্থাৎ ৯৬৩ অব্দের সূত্রপাত হয়। যেহেতু ৯৬৩ হিজরির মুহররম মাস বাংলা বৈশাখ মাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, সেহেতু তিনি চৈত্র মাসের পরিবর্তে বৈশাখ মাসকেই বাংলা বর্ষের প্রথম মাস হিসেবে বিবেচনা করেন। চৈত্র ছিল শক বা শকাব্দ বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস যা সে সময় বঙ্গে ব্যবহৃত হতো।

আরেকটি মজার ব্যাপার হলো সম্রাট আকবর যখন বাংলা সন প্রবর্তন করেন তখন গ্রেগোরিয়ান বা ইংরেজি সাল এবং হিজরি বর্ষের মধ্যে পার্থক্য ছিল ১৫৫৬–৯৬৩ = ৫৯৩ বছর। এই ৫৯৩-এর সঙ্গে আমরা যদি নতুন বাংলা সন যোগ করি তাহলে বর্তমান ইংরেজি সাল পাবো। কীভাবে, এখন সেটা বলি। আগত নতুন বাংলা সন ১৪৩১-এর সঙ্গে ৫৯৩-এর যোগ করলে দাঁড়ায় ১৪৩১+৫৯৩ = ২০২৪, অর্থাৎ ইংরেজি ২০২৪ সাল।

বাংলা সন গণনার ক্ষেত্রে এত সহজ একটি সমীকরণ আবিষ্কার করার জন্য আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে সালাম। সালাম সম্রাট আকবর। সালাম সভাসদ আবুল ফজল। স্বাগতম বাংলা ১৪৩১। স্বাগতম পহেলা বৈশাখ। বৈশাখে সারা দেশে উৎসবের ঢল নামুক। প্রতিটি মানুষের হৃদয় ভরে যাক আনন্দে। উৎসবে জাগুক দেশ। উৎসবে ভাসুক দেশ। উৎসবে মাতুক দেশ। উৎসবের আলোয় আলোকিত হোক এই চরাচর। এই লাল-সবুজের পতাকা। ❑

উপপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সিদরাতুল মুনতাহা, সপ্তম শ্রেণি, কামাল স্মৃতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হোমনা, কুমিল্লা

ছোটোদের ছড়া

আসুক আলো

শাহীনা আক্তার

নতুন বছর বৈশাখ
ফিরে এল আবার।

চারিদিকে হইচই!
নানা রকম খাবার।

আজ সারাদিন ছুটি
খুশির লুটোপুটি।

ঢোলের সাথে তবলা বাজে
পুতুল নাচে তালে তালে।

রং লেগেছে সবার মনে
আঁধার কেটে আসুক আলো ধেয়ে।

অষ্টম শ্রেণি, মতিঝিল মডেল হাই স্কুল

বৈশাখি সুর

হাসিবুল ইসলাম

মনের মাঝে তা ধিন ধিন,
বৈশাখি সুর বাজে।
বটতলায় গাইব গান,
সাজব রঙ্গিন সাজে
বছর ঘুরে এল পহেলা বৈশাখ,
মনে নেচে উঠল খুশির জয়ঢাক।
চারদিকেতে আনন্দ বসবে বৈশাখি মেলা
বাশের বাশি মাটির পুতুল কিনতেই যাবে বেলা

৫ম শ্রেণি, বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা

নববর্ষে

তাসিন হোসেন

নববর্ষের প্রথম দিনে
নতুন পোশাক পরে
খুশির রঙের ছোঁয়ায়
হৃদয় উঠে ভরে।

পুরোনো দুঃখ-কষ্ট ফেলে
হাসব প্রাণ খুলে
সম্প্রীতি ছড়িয়ে দিয়ে
যাব এগিয়ে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে।

দশম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

গল্প

বনরাজের বৈশাখনামা

তারিকুল আমিন

‘ড্যাডি ড্যাডি! কাল ১৪ তারিখ আমাদের স্কুল বন্ধ। সেদিন নাকি পহেলা বৈশাখ। ড্যাডি, পহেলা বৈশাখ কী? সেদিন মানুষ কী করে? জানো! ম্যাম বলল, সেদিন নাকি মেলা বসবে! সেখানে নাকি হরেক রকমের মিষ্টি পাওয়া যায়! মাটির খেলনা পাওয়া যায়।

-ম্যাম বলল, কাল মেলা থেকে তার জন্য সুন্দর একটি মাটির উপহার নিয়ে যেতে।’

-হ্যাঁ, তোমার ম্যাম সঠিক বলেছে। আমাদের সময় নানা রং-বেরঙের পোশাকে সজ্জিত হয়ে সকল বয়েসি

মানুষজন অংশ নিত এই উৎসবে। বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হয় বৈশাখি মেলা। সেখানে থাকে পান্তা-ইলিশ খাওয়ার আয়োজন। সব মিলিয়ে এক অনাবিল আনন্দ উৎসবে মাতে সমগ্র বাঙালি জাতি। সবাই এক কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' বলে নববর্ষকে স্বাগত জানায়।

বটতলার মেলার জন্য সারা বছর গ্রামের মানুষ মুখিয়ে থাকত এক সময়। এখন বৈশাখি মেলার আয়োজনে

অনেক পরিবর্তন এলেও মেলার আনন্দ এতটুকু কমেনি। গ্রামের সবচেয়ে পুরনো বটতলায় এ মেলা বসত বলে একে 'বটতলার মেলা' বলেই লোকে ডাকত। এ মেলায় গ্রামের কামার-কুমার আর তাঁতিদের হস্তশিল্পের অসাধারণ কারুকাজের আয়োজন থাকে। স্থানীয় কুমারের হাতে তৈরি মাটির খেলনা থাকে। আরো থাকে মণ্ডা-মিঠাই, চরকি, বেলুন, ভেঁপু, বাঁশি আর ভাঁজাপোড়া খাবার-দাবার এসব মেলার প্রধান আকর্ষণ। বাড়ির পাশের এ মেলায় ছেলে-বুড়ো সবার উপস্থিতি সমান। তখন এ মেলা যেন গ্রামবাসীর আদি উৎসবের ডাক দিয়ে যায়। এই সময় ব্যাবসায়ীরা হিসাবের নতুন খাতা- 'হালখাতা' খোলেন বৈশাখের প্রথম দিনে।

-ড্যাডি! হালখাতা কী?

-হালখাতা হলো বছরের প্রথম দিনে দোকানপাটের হিসাব আনুষ্ঠানিকভাবে হালনাগাদ করার প্রক্রিয়াকে বুঝায় বাবা। বছরের প্রথম দিনে ব্যাবসায়ীরা তাদের দেনা-পাওনার হিসাব সমন্বয় করে এদিন হিসাবের নতুন খাতা খোলেন। এজন্য ব্যাবসায়ীরা সকল ক্রেতাদের জন্য মিষ্টান্নেরও আয়োজন করত। নববর্ষ উপলক্ষ্যে গ্রামেগঞ্জে, নদীর পাড়ে, খোলা মাঠে কিংবা বটগাছের ছায়ায় মেলার আয়োজন করা হয়। দোকানিরা মুড়ি, মুড়কি, পুতুল, খেলনা, মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, বাঁশিসহ বাঁশের তৈরি বিভিন্ন জিনিসের পসরা নিয়ে বসে। এভাবে বৈশাখ আসে আমাদের প্রাণের উৎসব হয়ে। আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে এটি এখন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাবা বনরাজ রাতে বাকি গল্প করব। এখন আমি বিশ্রাম নেই।

-বনরাজ বলল, আচ্ছা ড্যাডি।

-বাবা ড্যাডি শব্দটা আমাদের নয়। তুমি যদি বাবা বলো তাহলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব।

-ওকে বাবা।

বনরাজ দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। ক্লাসের ফার্স্ট বয়। বনরাজ খুব শান্ত ছেলে। বনরাজ পশুপাখি ও মানুষের কষ্ট দেখতে পারে না। এই ছোটো বয়সে কাউকে সাহায্য করতে না পারলেও চেষ্টা করে যায়। একদিন বনরাজ রাস্তা দিয়ে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছে। পাড়ার কিছু দুষ্টু ছেলে একটি বিড়ালকে প্রচণ্ড মারছে। এ দেখে বনরাজ খুব ব্যথিত হয়। বনরাজ এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। এ ধরনের আরেকটি পীড়াদায়ক ঘটনা ঘটে তা হচ্ছে একজন ফুটফুটে শিশু চা বিক্রি করছে। একজন ভদ্রলোক চা খেয়ে বিল না দিয়ে চলে যাচ্ছিল। বাচ্চা মেয়েটি একবার চেয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়বার চাওয়ার দুঃসাহস দেখায়নি। হয়ত কোনো মাস্তান হবে। কিন্তু বনরাজ তার সম্মুখে গিয়ে বেড়িগেট দিয়ে দাঁড়ায়। বলল, দাঁড়াও! আংকেল তুমি মেয়েটির পয়সা না দিয়ে চলে যাচ্ছ কেন? ওর টাকা ওকে দিয়ে দাও। ভদ্রলোকটি না দিয়ে বনরাজকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। মেয়েটি এসে বনরাজকে উঠিয়ে সব কথা বলে। এরপর বনরাজের কাছে

টিফিন খাওয়ার টাকা ছিল মাত্র পাঁচ টাকা। সেই টাকা মেয়েটিকে দিয়ে বলল,

-এই নাও তোমার চা এর দাম। যাও অন্যদের নিকট বিক্রি করো।

বনরাজ সুন্দর একটি হাসি দিয়ে চলে গেল। আজ স্কুলে গিয়ে টিফিনের সময় কিছু না খেয়ে বসে রইল। আজ বনরাজের নিকট যা টাকা ছিল তা মেয়েটিকে দিয়ে দিয়েছে। তাই আজ অভুক্ত থাকতে হয়। এমন সময় বনরাজের বন্ধু অতিন্দ্র, বুদ্ধ, টম মিলে একটি বাটিতে খাবার নিয়ে বনরাজকে খেতে দেয়।

পরের দিন বনরাজের বাবা-মা বনরাজের জন্য নতুন বৈশাখি পোশাক কিনতে বাজারে যায়। বনরাজের মনে আনন্দ যেন পাহাড়সম। বাবা-মার হাত ধরে বাজারে যায় বনরাজ। বাজারে গিয়ে বৈশাখের নতুন ফতুয়া আর একটি প্যান্ট কিনে। যাকে বলে বাঙালি পোশাক। তারপর জুতো কিনে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। বাড়ি ফেরার সময় পথে দেখে কতগুলো শিশু ময়লা কাপড় পড়ে বসে আছে। কারো শরীরে কাপড় নেই। যাদের আছে তাদের কাপড় শতশত তালি আর ময়লায় চট পরে গেছে। ওরা জানেও না যে বৈশাখ কী? সেদিন কী করতে হয়। কারণ শুক্র-শনিবার মানুষ ঘুরতে যায়। সেদিন ওরা ফুল, চা এসব বিক্রি করে। তাই ওরা সবদিন এক মনে করে। কারণ এই পথ, রাস্তা আর হাজার হাজার মানুষের ভিড়। এই অবস্থা দেখে বনরাজ খুব ব্যথিত হয়। বনরাজ বাসায় গিয়ে ঘর থেকে ওর কাপড়গুলো ওদের দিয়ে আসে। পোশাক পেয়ে ওরা তো মহা খুশি। সকলে ভালো ভালো পোশাক পড়ে যেভাবে ছুটছে তা দেখে বনরাজের আনন্দ যেন কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।

-ড্যাডি! ও দুঃখিত! বাবা, তুমি তো সেদিন বৈশাখ নিয়ে আর গল্প করলে না।

-ও ভুলে গেছি বাবা। তাহলে শোনো, আমি যখন ছোটো ছিলাম তখন গ্রামে গ্রামে বসত মেলা, সেখানে নাগরদোলা, পুতুলনাচ, যাত্রাপালা, ঘোড়া দৌড়, লাঠিখেলা, নৌকাবাইচ, বউমেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয়। তোমার চাচা আর আমি মেলায় গিয়েছি। তখন তোমার চাচার বয়স কত আর হবে তোমার মতোই। আমি আর ও নাগরদোলায় উঠেছি। দুজনে অনেক মজা করলাম। ও নিচে নেমে সাথে সাথে এ গাছের সাথে ও গাছের সাথে ধাক্কা খায়। সেদিন ওর ওই দৃশ্য সত্যি খুব ভালো ছিল। মজার ও আনন্দদায়ক ছিল।

-হা হা হা হা!

এভাবে বাপ আর ছেলের মধ্যে গল্প চলল। হঠাৎ মা বলল, হয়েছে আর গল্প করতে হবে না। এখন লাইট অফ করো। রাত পোহালেই পহেলা বৈশাখ।

সকাল হয়েছে। বনরাজ তৈরি হচ্ছে। নতুন পোশাক পরে মেলায় যাবে। নাগরদোলায় চড়বে। এই খুশিতে পোশাক পড়তে যাবে। এমন সময় বেজে উঠল কলিংবেল। বনরাজ ভেবেছে যে চাচা হয়ত এসেছে। খুলে গিয়ে দেখে একটি পথশিশু নোংড়া আর ছেঁড়া কাপড় পরা। এই অবস্থা দেখে বনরাজ তার নতুন পোশাক ছেলেটিকে দিয়ে দিল। ছেলেটি নতুন পোশাক পেয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল। এরপর পুরোনো একটি বের করে পড়তে যাবে এমন সময় আবার কলিংবেল। খুলে রীতিমতো অবাক। দরজার পাশে একটি শপিং ব্যাগ পরে আছে। ভিতরে নিয়ে দেখে একটি খুব সুন্দর ফতুয়া। পাশে একটি চিরকুট লেখা আছে।

‘এটা তোমার জন্য বন্ধু।
বৈশাখের এই দিনে
হাসি ঝড়ুক সবার মাঝে।’
এমন সময় ভেসে আসলো গানের সুর।
‘মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা ,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা...
এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো, ...’

ইতি

তোমার পথশিশু বন্ধুরা। ❑

প্রাবন্ধিক, গল্পকার, অভিনয় ও আবৃত্তি শিল্পী

কবিতায় ঈদ

ঈদের শুভেচ্ছা

রুস্তম আলী

উৎসবে উল্লাসে নেচে উঠে মন
শুভেচ্ছা জানাতে
গোলাপ, বেলি আর কৃষ্ণচূড়ার
হয় না প্রয়োজন।

অচেনাকে চেনা মনে হয়
পৌষের সূর্যোদয়ের মতো
হৃদয়ে আনন্দে উপচে পড়া ঢেউ
মুছে নিয়ে যায় ধূলিকণা যত।

হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান
সকলেই ধর্ম, বর্ণহীন
নাই ভেদাভেদ নাই কারো ঋণ
ঈদের খুশির দিন।

কী যে এক আকর্ষণে
ছুটে যাই মুগ্ধ মনে
নতুন পোশাকে
ঈদ গাঁয়ের মাঠে।

স্মৃতির পাতায় জমা যত গ্লানি
মুছে যায় নিমিষে
অশ্রুসজল ছোঁয়া আবেগের ভাষা
ঈদের মাঝে খুঁজে পাই
নতুনের আশা।

ঈদের ছুটি

গোলাম নবী পান্না

কখন আসবে ঈদের ছুটি
খুশির হলুদ খামে
লম্বা ছুটির ছুটোছুটি
পৌঁছে যাব গ্রামে।

হেসেই খাব লুটোপুটি
দারুণ মজা হবে
অপেক্ষা আর সয় না যেন
হবে কখন কবে?

আসে যখন মাহেন্দ্রক্ষণ
আনন্দ আর ধরে!
ছুটির মজা সবার কাছে
আসে এমন করে।

ঈদের হাসি

আতিক রহমান

আমায় নিয়ে ঝিকিঝিকি সুখেরই ট্রেন চলে
দুঃখগুলো বরফ হয়ে গলে শুধুই গলে!
মনের ঘরে সুখ পেতেছে ছোট্ট রঙিন বাসা
মন- আকাশে বৃষ্টি হয়ে ঝরছে ভালোবাসা
ভালোবাসার ছোঁয়ায় আজি হিংসা ও দ্বেষ ম্লান
মন-বাগানে ফুটেছে ফুল, নেবে নাকি ঘ্রাণ?

আমায় নিয়ে মন-দরিয়ায় সুখের জাহাজ ভাসে
সাতরঙা রংধনুর সাথে মন- ময়ূরী হাসে!
হাসি-খুশি মন যেন আজ ছলাৎ ছলাৎ নদী
পাবদা-পুঁটি কাটছে সাঁতার যেন নিরবধি
সবই শুভ এত খুশি এত আলোর বান

প্রজাপতি প্রাণটি আমার আনন্দে আটখান!
ঠিক তখনি 'ঈদের হাসি' ওই আকাশের বুকে
দিচ্ছে উঁকি, হাসির ঝিলিক ফুটল সবার মুখে!

বায়না

শাহরিয়ার শাহাদাত

ছোটন যাবে চাঁদের দেশে
বায়না ধরে বলল হেসে
যাওয়ার অনেক সাধ,
রকেট চড়ে দেখব গিয়ে
ঈদের বাঁকা চাঁদ।

মহাকাশে নামব আমি
হয়ে খুদে চন্দ্রগামি
ঈদের চাঁদে কী আনন্দ
কোন সে জাদু আছে !
মঙ্গল থেকে নেপচুনে যাই
যাই ইউরেনাসে !

তারার ভিড়ে ভেসে ভেসে
গ্যালাক্সিও পেরিয়ে শেষে
খুঁজব সকল গ্রহ,
ও চাঁদ তুমি কোথায় রাখো
খুশি অহরহ?

ঈদ আনন্দ

এইচ এস সরোয়ারদী

চাঁদ উঠেছে, চাঁদ উঠেছে
চাঁদ উঠেছে ওই
ঈদ আনন্দে খোকা-খুকু
করছে যে হইচই।

আমার প্রিয় বড়ো মামা
আনছে কিনে নতুন জামা
আরো কত কী!
বাবার জন্য পাঞ্জাবি আর
মায়ের জন্য ঘি।

কি যে খুশি লাগছে মনে
ফুল ফুটেছে বনে বনে
গাইছে পাখি খুব,
ঈদ আনন্দে বদলে গেছে
আমার গাঁয়ের রূপ।

স্বপ্ন রঙিন ঈদ

মঈনুল হক চৌধুরী

চাঁদের খোঁজে সবাই গেছে মাঠে
রোজা শেষে ঈদ হবে যে তাই,
আকাশ জুড়ে উঠবে ঈদের চাঁদ
মনটাতে আজ খুশির সীমা নাই।

আকাশ জুড়ে মেঘের আনাগোনা
সবাই অধীর অপেক্ষাতে খোঁজে,
ঈদের নতুন চাঁদটা কোথায় ওঠে
খুকুমনি ক্লান্তিতে চোখ বোজে।

বাজল হঠাৎ সাইরেনের সুর
দূর আকাশে উঠল ঈদের চাঁদ,
দল বেধে সব দৌড়ে ছুটে গেল
ভাঙল বুঝি অপেক্ষারই বাঁধ।

চাঁদ উঠেছে কালকে মজার ঈদ
ছড়িয়ে গেছে সবখানে তার আলো,
বাঁকা চাঁদের খুশির আমেজ কত
দূর করে দেয় যত আঁধার কালো।

ঈদগাহে ঈদের নামাজ হবে
গরিব-ধনী এক কাতারে সব,
নেই হিংসে মনে খুশির ঢেউ
ঈদ হলো যে মহান এক উৎসব।

ঈদের আলোয় এই পৃথিবীর সবাই
স্বপ্নরঙিন স্বপ্ন দেখে হাসুক,
ঈদের খুশি গরিব-ধনীর মাঝে
ঈদের খুশি বারে বারে আসুক।

ঈদ বাতাসে

মিতুল সাইফ

ঈদের বাতাসে উড়ে আসে ছেলেবেলা,
আস্তরণ খসে পড়া কত না পুরানো স্মৃতি
দরজাতে টোকা দেয়;
ফিরে আসে মেহেদি রঙিন সন্ধ্যা।
কতশত প্রিয়মুখ সাবলীল চেয়ে থাকে
চৌরাস্তার শপিং মলের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকে
শত জোড়া চোখ
আমি কাকে ফেরাই! ফিরিয়ে আনি কাকে
শেষ বিকেলের আলো ফুরিয়ে আসে।

ঈদের আনন্দ

ফরিদ সাইদ

শাওয়াল মাসের চাঁদ উঠেছে
খুশির জোয়ার মনে
বাজার ঘাটে কেনাকাটায়
ব্যস্ত নানান জনে।

অনাহারী অভাবীদের
সবার খবর নেব
মলিন মুখে ফুল ফোটাতে
খাবার তুলে দেব।

এসো নবীন ঈদের খুশি
ভাগাভাগি করি
দানের দুহাত প্রসার করে
সুখের সমাজ গড়ি।

ঈদের খুশি

রাশেদ আহাম্মেদ সাদী

সাঁজ আকাশে হেলাল দেখি
দেখি তারার খেলা
ঈদ মোবারক ঈদের খুশি
জমেছে আজ মেলা।

কেনাকাটায় ধুম পড়েছে
মল পাড়াতে আজ
জামাকাপড় আতর টুপি
এসব কেনাই কাজ।

কতজনের শখের বাহার
কিনছে আংটি দুল
টিউব মেহেদি লাগিয়ে কেউ বা
আঁকছে হাতে ফুল।

আশা বেধে কেউ বা থাকে
দূর গাঁয়েরই ধারে
আনন্দের এই খুশির দিনে
তাদের মনে পড়ে।

সেকালের গ্রামের ঈদ

মুন্সি মো. নজরুল ইসলাম

ঈদ আসে আমাদের আটপৌরে জীবনের ফাঁকে খুশির বন্যায় ভাসতে, খানদানী খাবার রাঁধতে, বৈচিত্র্যময় পোশাকে সাজতে, ঘুরে বেড়াতে, আড্ডায়, টিভির সামনে, ভার্চুয়াল মাধ্যমে মগ্নতায় অনাবিল দিন পার করতে। না, আজকের দিনের এমন শহুরে ঈদ অর্ধ শতাব্দী আগের গ্রামগুলোতে কল্পনাও করা যেত না। সেকালে গ্রামের ঈদ আসত পবিত্রতার আলিঙ্গনে। মিলনের বন্ধনে।

মানুষ সবাই সমান, সমান মর্যাদার অধিকারী, ছোটো বড়ো কারো ভেদাভেদ নেই, এই চেতনা আর উপলব্ধির নাম ঈদ। ঈদ মানে আনন্দ। ভুলগুলো ক্ষমা করার শ্রেষ্ঠ সময় ঈদের দিন। তাই তো ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা বছরে দুটি ঈদ ফিরে ফিরে আসে উৎসবের আমেজে।

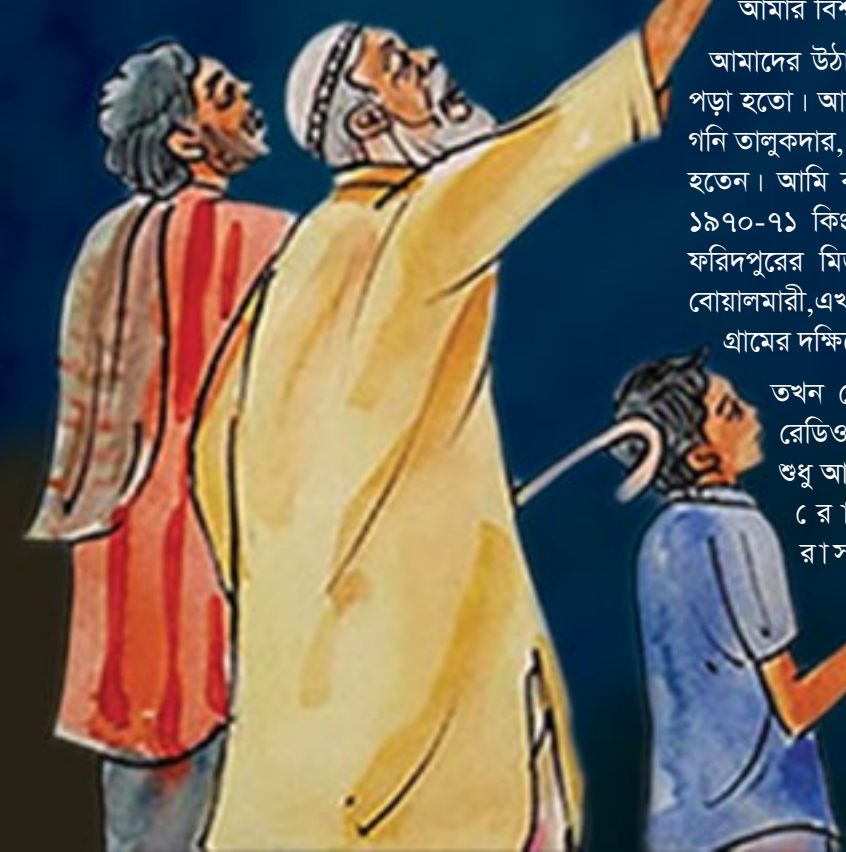

আমাদের ছেলেবেলায় ঈদের আগমনী ধ্বনি বেজে উঠত শাবান মাস থেকেই। শবেবরাতের মধ্য দিয়ে শুরু হতো ঘরবাড়ি, কাপড়চোপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। আসবাব, তৈজস পরিপাটি করা। কেরোসিনে জ্বালানো হারিকেন সাফ করে রাখা। চালের গুঁড়া তৈরি। রুটি, পিঠা তৈরির প্রস্তুতি এইসব করে। পাশের গ্রামের মোকছেদ মোল্লাকে দাওয়াত করা। দুটো রোজা থাকা। বাবা-মা'র সেই দুই রোজায় বুঝতাম রমজানের রোজা আসছে। রোজা আসার আগেই বাবা তাঁর পড়শিদের কিছু কিছু মাসালা মাসায়েল শুনাতে থাকতেন হাদিস-কুরান পড়ে। তাহাজ্জুদ,ইতিকাফ নিয়ে কথা বলতেন। সেহ্‌রি, ইফতারের সময় বলতেন পঞ্জিকার পাতা উল্‌টে। প্রতিদিন কুরানের তিলাওয়াত এগিয়ে নিতেন। পড়শিরা তারাবির নামাজের আয়োজন জানতে আসতেন। মসজিদ তো ছিল গ্রামের শেষ মাথায়। যতদূর মনে পড়ে সূরা ফাতিহা কষ্ট করে আমাকে মুখস্ত করতে হয়নি। বাবার দৈনিক নামাজ আদায়ে ক্বিরাত শুনেই মনে গেঁথে গেছে বলে আমার বিশ্বাস। এমনই ছিল বাবার দ্বীনদারী।

আমাদের উঠানে আজান দিয়ে কাচারি ঘরে তারাবি পড়া হতো। আব্বার সে আয়োজনে আহম্মদ হোসেন, গনি তালুকদার, জয়নাল শেখ, গফুর ভূঁইয়া এরা শরীক হতেন। আমি বলছি অর্ধ শতাব্দীকাল আগের কথা। ১৯৭০-৭১ কিংবা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের কথা। ফরিদপুরের মির্জাকান্দি গ্রামের কথা। এক সময়ের বোয়ালমারী,এখন মধুখালি উপজেলায় সে গ্রাম। গ্রামের দক্ষিণে কুলুকুলু রবে বয়ে গেছে কুমার নদ।

তখন তো টেলিভিশনের যুগ ছিল না, ছিল রেডিওর যুগ। রেডিওতে রোজার মাসেই শুধু আজান প্রচার হতো। সেহরি অধিবেশনে রোজার ফজিলত,হাম্‌দ,না'তে রাসূল প্রচার হতো। কুরানের খতম পড়া শুনতাম বিকেলে।

এরপর মুনাজাত, আজান হতো। সবার হাতে ঘড়ি ছিল না। ইফতার করার জন্য রেডিওর আজান ছিল নির্ভরযোগ্য। ছোট্টবেলায় সেহ্‌রি খাবার জন্য বায়না ধরতাম। অনেক আবদারের পর মা আমাকে ডেকে তুলে সেহরি খাওয়াতেন। অবশ্য সকালে শুকনো কচিমুখ দেখে ঠিকই খাবার মুখে দিয়ে রোজা ভাঙাতো।

আমাদের গ্রামের বুক চিরে উত্তর-দক্ষিণে রাস্তা। সে রাস্তায় ১৯৭০ সালে ইট বিছানো হয়েছিল। আর বাড়িটা গ্রামের হিন্দু অধ্যুষিত উত্তর পাড়ায়। বাড়ির উত্তরে ব্রিজ। পুবের মাঠের পানি প্রবল স্রোতে পশ্চিমে গড়াত। ব্রিজের রেলিং এর উপর থেকে সমবয়সি দলবল নিয়ে লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তাম তীব্র স্রোতে। বিলের হাঁসের মতো ডুব-সাঁতার খেলতে খেলতে আবার উঠে আসতাম। বর্ষার সে ঝাঁপাঝাপিতে চোখ লাল হয়ে যেত, উপরের ঠোঁটের উপর দিয়ে জমত কাদার প্রলেপ। বর্ষাকালের ঈদে কখনো নৌকায়,কখনো কলাগাছের ভেলায় সমবয়সি পড়শিদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে গোসল করত গ্রামের বালকের দল। আজমত, জয়নাল এদের সবার সাথে ভাগাভাগি করে তিব্বত সাবান মাখতাম । রোজার শেষে ঈদ আসবে-তার জন্য আমরা ছোটোরা অধীর অপেক্ষায় থাকতাম। ২৯/৩০ রোজায় রাস্তার ফাঁকা জায়গায় পশ্চিমমুখো হয়ে শাওয়ালের চাঁদ খুঁজতাম। প্রথম দেখতে পাওয়ার আনন্দ ছিল অপার্থিব। আকাশ মেঘলা থাকলে রেডিওতে সবাই কান রাখতাম। নজরুলের বিখ্যাত ঈদসংগীত 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ'...শুনলেই বুঝতাম ঈদের চাঁদ দেখা গেছে। এ গান ঈদের আগমনধ্বনি হয়ে আসত। ঈদের আনন্দকে কানায় কানায় ভরিয়ে দিতো।

আমাদের গ্রামের দক্ষিণের শেষ প্রান্তকে বলে নড়ীখালি মোড়। সেই নড়ীখালিতে গ্রামের মসজিদ প্রায় এক মাইল দূরে। টিনের বেড়া। সামনে খোলা মাঠ। মাঠের কোনায় ছোটো বটগাছ। মসজিদের পিছনেই খাল আর নদীর মোহনা। প্রত্যেক বাড়ি থেকে মাদুর,জায়নামাজ নিয়ে যেতাম। ঘাসের উপর বিছিয়ে নামাজ পড়তাম। গ্রামের সাধারণ অনেকেই লুঙ্গি আর হাফ হাতা গেঞ্জি পরে নামাজ পড়ত। একটু যারা সামর্থ্যবান তারা নিচের দিকটা পাঞ্জাবির মতো লম্বা ঝুল,উপরের দিকে কলারওয়ালা ফুলহাতা জামা পড়তেন। ধনী আর ইমাম মৌলবীদের শুধু পাঞ্জাবি পড়তে দেখতাম।

বাবা (১৯৩১-১৯৯৬) ছিলেন শিক্ষিত চাষি। আধুনিক মানুষ। ডাকযোগে পত্রিকা আনতেন। বাইরে বের হলে ঘড়ি পরতেন। নিয়মিত রেডিও শুনতেন। ১১/১২ মাইল সাইকেল চালিয়ে শহরে গিয়ে দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়ে আসতেন। পত্রিকাগুলো চাচাদের ঘরসহ বাড়ির চার ধারের ৪ ঘরে হাতবদল করে পড়া হতো। আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে গেলেও পত্রিকা, হাদিসের বই সাথে নিতেন বাবা। সেখানকার মানুষদের পড়ে শুনাতেন।

ঈদের সকালে রোজকার মতোই বাবা অতি ভোরে উঠতেন। নামাজ সেরে সুরা ইয়াসিনসহ অন্যান্য মুখস্ত সব অজিফা পড়তেন। সুর করে মিলাদ পড়তেন। সকাল সকাল গোসল সেরে আমাদেরও তাগিদ দিতেন। দরুদ পড়তে পড়তে বাবা হতেন ঈদের মাঠের প্রথম মুসল্লি। বাবার তিলাওয়াত, তকবীর, দরুদ ঈদের মাঠকে মুখরিত করে তুলত। কাশেম ক্বারীর খুৎবা শুনতাম যেন গায়েবি আওয়াজ। গমগম করা সে আওয়াজ আজও কানে অনুরণিত হতে থাকে। কয়েক গ্রামের মানুষের একসাথে নামাজ হতো। তবুও সেসময় কোনো মাইক ছিল না। শামিয়ানাও ছিল না। গ্রাম্য জামাত বেশ দেরিতেই হতো। ঈদের সকালে অনেক গেরস্থ নিজের পালের গরুকে গোসল দিয়ে তারপর নিজে গোসল সেরে ঈদের মাঠে আসত। কিস্তি টুপি বেশি দেখা যেত সেই সময়ে। আজকের দিনের এত বর্ণিল টুপি তখন ছিল না। ঈমামের কথায় থাকত ফিৎরার বয়ান। তকবীরের সমবেত আওয়াজ অপার্থিব শিহরণ এনে দিত। নামাজ শেষে দীর্ঘ মোনাজাতে সবাই শরীক থাকতাম কান্নাজড়িত হয়ে। প্রখর রোদে সবার ঘাম ঝরত। কোলাকুলি করে দোয়া নিতাম ছোটো-বড়ো ভেদাভেদ ভুলে। ফিৎরা ছাড়াও ঈদের জামাত থেকে ফিরতে,ঈদের দিনে বাবাকে বেশি বেশি দান খয়রাত করতে দেখতাম। দেখতাম দাদার কবর জিয়ারত করতেন।

ঈদের ময়দানে মোহন চাচা আর রহমান চাচার খাবার দোকানে ভিড় করতাম। দানাদার জিলাপি, খোরমা,

বাতাসা, নিমকি এইসব কিনে খেতে থাকতাম। চুড়ি-দানা মালা, বেলুন আর ছোটো ছোটো খেলনার দোকানও বসত।

সেকালে দোকানপাট খুব কম ছিল। এখনকার মতো হরেক রকম কাপড়চোপড়ও বাজারে ছিল না। বিলাস সামগ্রীও তাই। সেকালের ঠাট্টা মশকরার ভাষাও আলাদা ছিল। কেউ টাইটফিট জামাকাপড় পরলে তাকে হটাৎবাবু মার্কা 'টেডি' বলে উপহাস করা হতো। আমাদের দু'ভাইকে বাবা ক্যারোলিনের শার্ট কিনে দিয়েছিলেন ঢাকা থেকে। হলুদ রঙের সে শার্টের ছিল নজরকাড়া আকর্ষণ। যা আমাদেরকে বালকসুলভ অহংকারী করত বৈকি! ঈদের আগে চাঁদপুর বাজারের আমিন দর্জিকে দিয়ে জামা বানানোর সিরিয়াল সবাই পেতো না। তখন আয়রন করার ব্যবস্থা খুব কমই ছিল। বাবাকে দেখতাম কাপড় ভাঁজ করে বালিশের নিচে রাখতে। তাতেই ইস্ত্রির কাজ হয়ে যেত। আমরা চার ভাইবোন সবাই আলাদা গামছা ব্যবহার করতাম। বাটার জুতা পরতাম। বাড়িতে খুব ছোটোবেলায় বড়োদের খড়ম পরতে দেখতাম। ছোটোরা পরতাম স্পঞ্জের স্যান্ডেল। ঈদের আগে গ্রামের হাটের পিঁড়ি পাতা নরসুন্দরের কাছে গেলেও দেরি হতো। এজন্য সাতসকালে তাদের বাড়ি গিয়ে চুল ছেঁটে আসাটাই রেওয়াজ ছিল। কখনো তারা আমদের বাড়িতে এসেও কাজ করে যেত। এ বাবদ নগদে টাকাপয়সা দিতে হতো না। ধান-পাট, ফসলাদি দিয়ে বছরে কয়েকবারে মজুরি দেওয়া হতো। যেমন নদী পারাপারের জন্য পাটনিকেও দেওয়া হতো।

ধর্ম-শ্রেণি নির্বিশেষে দারুণ সৌহার্দ্য ছিল সবার সাথে। মেহমানদারি ছিল অতিশয় আন্তরিকতা মাখানো। সারা বছর মিষ্টি, পিঠার আয়োজন আমাদের ঘরে লেগেই থাকত। আত্মীয়, পড়শি, মুসাফিরদের আশ্রয় আর খানা হতো আমার মা'র হাতে। বসন্ত দাস, ভজহরি কাকা, আনন্দ মেম্বার এরা মায়ের রান্না পছন্দ করত। এদেরকে পরমভক্তি আর খাতির করতেন বাবা। তারাও বাবাকে অশেষ স্নেহ করতেন। আমার দাদার আমল থেকেই বড়ো পূজার পর সাজ বাতাসার হাড়ি আসত মতি দাসের বাড়ি থেকে। দাদিকে প্রণাম করত উপঢৌকন নিয়ে আসা ছেলেরা। মাথায় ধান-দূর্বা

আর দু'জোড়া নারকেল তাদের হাতে দিয়ে দাদি আশির্বাদ করত। দাদি মারা যাবার পর ভক্তিরসের সে প্রণাম পেত মা।

গ্রামের সাধারণ মানুষদের শুধু ছোলা ভাজা দিয়ে রোজা ভাঙার চল ছিল। ঈদের সকালেও রোজকার সকালের রান্নার মতোই রান্না হতো। বাড়তি ফিরনি পায়েস করার সামর্থ্য সবার হতো না। অবস্থাপন্ন লোকদের ইফতারে বৈচিত্র্য থাকত। শরবত, বেগুনি, ডালের বড়া, ছোলা-মুড়ি, ফিরনি, ফল-ফলাদি এইসব। আরো পরে আমার সমবয়সি হিন্দু বন্ধুরা আমাদের বাড়ির রোজার ইফতারির জন্য অপেক্ষায় থাকত। ঈদে মোরগ পোলাও, হাতে কাটা সেমাই, কলের সেমাই, জর্দা বেশি আদরনীয় আইটেম হিসেবে থাকত। এমনি সচরাচর গ্রামের বাড়িতে পোলাও হতো না। হতো ঈদ, পালা-পার্বণে, বিশেষ অতিথি-মেহমানের আগমনে।

শৈশবে ঈদের বিশেষ স্মৃতি রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বছরের। পাক সেনাদের চোখ এড়িয়ে ঈদের জামাত করা হয়েছিল। গ্রামের মাঝখানে চাষ করে রাখা ভীষণ

শক্ত ইটা ক্ষেত পার হয়ে ফকির বাড়ির পুবের ভিটায়, ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে। পাকিস্তানি আর্মির আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবার জন্য।

ঈদ উপলক্ষ্যে নতুন জামাই বোনাইদের অতিশয় আদরে দাওয়াত করা হতো। রিকশার ছাউনিতে শাড়ি পেঁচিয়ে ফুপুদের দেখতাম সোয়ারি হয়ে আসতে। বাড়ির সবাই মিলে এ বাড়ি-ওবাড়ি ঈদের আয়োজনে মেতে ওঠা, আড্ডা দেওয়া ছিল বিশেষ পর্ব। সেখানে দাদা-দাদি মুরুব্বিদের আদর-কদর ছিল সবচেয়ে বেশি। হা-ডু-ডু খেলা জমত ঈদ উপলক্ষ্যে পাড়া-মহল্লায়।

এসডিও মেজো চাচা, বড়ো কাকাকে মনিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়ে হয়ত লিখতেন, এবারের ঈদে বাড়ি যাওয়া হবে না, কাজের চাপ বেশি। পোস্টকার্ডে চিঠি লিখে দাদির খবর নিতেন। নামমাত্র লেখাপড়া জানা মোমিন পিওন এসব বার্তা নিয়ে আসতেন।

টিভি নয়, রেডিওর নাটকেই সপরিবারে ঈদের বিনোদন পিপাসা মিটত সেই দিনগুলোতে। কলেজ পড়ুয়াদের বিনোদনের সেরা আকর্ষণ ছিল শহরে গিয়ে ঈদে মুক্তি পাওয়া নতুন সিনেমা দেখা। স্কুল পড়ুয়ারাও তাতে কম যেত না। আমিও তো বাবার সাথেই প্রথমবার নয়নমণি সিনেমা দেখেছিলাম। সেই দিনগুলো ছিল বই পড়ার। আমিও একটু বড়ো হয়ে সাহিত্যপাঠে আনন্দ খুঁজতে থাকি। আমার মতো অনেকেই সাপ্তাহিক পত্রিকার ঈদ সংখ্যা কিনে পড়তাম। বিচিত্রা, আরো পরে রোববার এইসব। স্কুলে পড়াকালে ঈদকার্ড উপহার পেতাম। আমিও দিতাম।

পাড়ার কিশোরদের পট্‌কা বাজিতে মেতে উপদ্রব সৃষ্টির কথা কল্পনাই করা যেত না। এখন ঈদে ব্যয় বেড়েছে। ভোগ বিলাস বেড়েছে। শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য ভার্চুয়াল যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। হারিয়ে যাচ্ছে আন্তরিক মানবীয় সম্পর্ক। পানসে হয়ে যাচ্ছে ভালোবাসার টানে কাছে পাওয়ার আনন্দ,সম্পর্কের গুরুত্ব। এখন ঈদের দিনেও যেন মানুষের মনের দূরত্ব রয়ে যায়! মনের বিচ্ছিন্নতায় ভালো লাগার ঈদের মূল চেতনাও যেন ফিকে হয়ে আসছে। ❑

প্রাবন্ধিক

করব রে হৈ চৈ

সালাম ফারুক

বাঁকা হাসির চাঁদটা বুঝি কেড়েই নিলো নিদ,
বছর ঘুরে এলো আবার আনন্দেরও ঈদ।
মা বসেছে পিঁড়ি পেতে পিঠায় যাবে রাত,
আমরা কি আর থাকি বলো না লাগিয়ে হাত?
পড়লে মনে ছুটে গিয়ে হাতাই জামাটায়,
কখন যে হায় সকাল হবে জড়াবো তা গায়!
বাড়ি বাড়ি ঘুরতে যাব দল বেঁধে সব আজ
সেলামির ওই নতুন টাকা করব না তো ভাঁজ।
হরেক পদের পিঠা খাবো মিষ্টি কিবা ঝাল,
চটপটি আর ফুচকা রবে, সেমাইও এক থাল।
কোরমা খাবো পোলাও খাবো সাথে মিঠা দই,
সময়মতো আসিস সবাই, করব রে হৈ চৈ।

ঈদের চাঁদ

মৌমিতা ইসলাম

ঈদের বার্তা নিয়ে
নতুন চাঁদ আকাশে আসে
সেই চাঁদ দেখে সবাই
ঈদের আনন্দেতে ভাসে।

নতুন জামা কাপড় পরে
সবাই মিলে ঈদগাহে যায়
মুখে কুশল বিনিময়ে হাসি দিয়ে
হাতে হাত মিলায়।

সপ্তম শ্রেণি, ভিকরুননিসা নূন স্কুল, ঢাকা।

পদ্মপুকুরের জোড়া তালগাছ

কুমার প্রীতীশ বল

কানুগাঁওয়ের একেবারে পূর্ব প্রান্তে যে পুকুরটি, ওটার নাম পদ্মপুকুর। পদ্মপুকুরের পানি কেউ দেখেনি। পদ্মপাতা আর নানান শাপলা-শালুকে পদ্মপুকুরের পানি ঢাকা পড়ে গেছে। পুকুরের পানি পরিষ্কার করার মতো সাহসী মানুষ কানুগাঁওয়ে নেই। পদ্মপুকুরে নামতে মানুষের অনেক ভয়।

পদ্মপুকুরের তিন পাশে তিন গাঁ। পদ্মপুকুর পড়েছে কানুগাঁওয়ের সীমানায়। আশপাশে কোনো বাড়িঘর নেই। পদ্মপুকুরের এক পাড় মিশে গেছে রাস্তার সঙ্গে। রাস্তাটা সোজা চলে গেছে কড়লডেঙ্গা পাহাড়ে।

পদ্মপুকুরের পাড়ে রয়েছে দুটি তালগাছ। তালগাছ দুটি বেশ লম্বা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তালগাছ কবিতার সেই তালগাছটার মতো। সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে। কানুগাঁওয়ে একটা কথা খুব চাওর আছে- যে তালগাছ রোপণ করে, সে তাল খেয়ে যেতে পারে না। তালগাছে নাকি তাল ধরে অনেক বছর পর। বুড়ো-বুড়িরা তাই ছোটোদের আশীর্বাদ করে বলেন, তাল লাগায় তাল খাও, তালের লাঠি হাতে নাও।

পদ্মপুকুর আর জোড়া তালগাছ নিয়ে একটা গল্প চালু আছে। কানুগাঁওয়ের সব মানুষ এ গল্প জানে।

কানুগাঁওয়ে প্রসন্ন বাবু নামে এক জমিদার ছিলেন। তাঁর হুঙ্কারে বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খেতো। তিনি এই পদ্মপুকুর খনন করেছিলেন। প্রসন্ন বাবু পুকুর পাড়ে তাল লাগিয়ে তাল খেতে চেয়েছিলেন। পুকুরটিতে পদ্মফুলের চাষও করেছিলেন। পুকুরের চার পাড়ে লাগিয়েছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত সব গোলাপ ফুল। প্রসন্ন বাবু পূর্ণিমার রাতে স্বপ্নে এমন এক পুকুর দেখেছিলেন। তারপর ১০৮ জন লোক লাগিয়ে তিনদিনের মধ্যে পুকুরটি খনন করেন। পুকুরের পানি ডাবের পানির মতো মিষ্টি ছিল। কানুগাঁওয়ের সাতজন মানুষ এই পুকুরের পানি পান করতে পেরেছিল। সাতজনের ছয়জন ছিল প্রসন্ন বাবুর পরিবারের। বাকি মানুষটি ছিল প্রসন্ন বাবুর ছায়াসঙ্গী জগবন্ধু। ছায়াসঙ্গী মানে পেছন পেছন ছাতা নিয়ে ঘুরত। প্রসন্ন বাবুর মাথায় ছাতা ধরত। ওই জগবন্ধু ডাবের পানির মতো মিষ্টি কথাখানা রটিয়েছে। পরে তো পদ্মপাতা আর

নানান শাপলা-শালুকে পদ্মপুকুরের পানি ঢাকা পড়ে যায়। তাই ওই পানি আর কেউ দেখেনি, খেতেও পারেনি।

জগবন্ধু আরও কিছু কথা রটিয়েছে।

পদ্মপুকুরে পূর্ণিমার রাতে উৎসব হতো। এ উৎসবের একমাত্র অতিথি থাকতেন প্রসন্ন বাবু। উৎসবের রাতে গোলাপ, শাপলা, শালুক, পদ্মফুলগুলো সব পরি হয়ে যায়। গোলাপ পরি, শাপলা পরি, শালুক পরি, পদ্ম পরি। ওরা নাচ করে। গান করে। প্রসন্ন বাবু সারা রাত ধরে এসব নাচ-গান উপভোগ করতেন।

আর খাওয়াদাওয়া? তা সরবরাহ করত ওই তালগাছ। তালের পিঠা, তালের বড়া, তালের কেক, তালের রস আরও নানান পদের তালের খাবার।

উৎসবে প্রসন্ন বাবু ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। এমনকি প্রসন্ন বাবুর ছায়াসঙ্গী জগবন্ধুরও প্রবেশ নিষেধ ছিল। এজন্য জগবন্ধু প্রথম প্রথম মন খারাপ করত। পরে বুঝে নিয়েছিল।

উৎসব থেকে আসার পরদিন প্রসন্ন বাবুকে খুব কাহিল মনে হতো। মনে হতো শরীরের উপর খুব ধকল গেছে। তা দেখে জগবন্ধু বলত, বাবু আপনি আর ওই উৎসবে যাইয়েন না।

প্রসন্ন বাবু তখন নাকি হাঁপাতে হাঁপাতে বলতেন, যেতে তো চাই নারে জগা। ওরা ধরে নিয়ে যায়। না গেলে যে আমায় মেরে ফেলবে।

একবার আমাকে নিয়ে যেতেন যদি। দেখতেন, আচ্ছা করে ওদের বকে দিয়ে আসতাম। জগা বলল।

তখন তোকেও শেষ করে দিত। আমাকেও শেষ করে দিত। এ উৎসবে আর কারো যাওয়া বারণ। প্রসন্ন বাবু কথাখানা বলে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে থাকলেন।

মৃত্যুর কথা শুনে জগবন্ধু চুপ মেরে গেল। জগবন্ধুকে প্রসন্ন বাবু জগা বলে ডাকতেন।

জৈষ্ঠ্যের পূর্ণিমায় প্রসন্ন বাবুর শরীর খুব খারাপ ছিল। হাঁটার মতো অবস্থা পর্যন্ত ছিল না। জগবন্ধু অনেক করে নিষেধ করে গিয়েছিল, আইজ উৎসবে যায়েন না বাবু। আপনের শরীর বহুত খারাপ আছে বাবু।

প্রসন্ন বাবু জগার নিষেধ মানেননি। কারণ তিনি জানতেন নিষেধের ফলাফল কি ভয়াবহ হতে পারে। প্রসন্ন বাবু সে রাতে একটু আগেভাগেই বৈঠকখানায় এসে অপেক্ষা করছিলেন। রাতটা আরেকটু গভীর হলে চাঁদটা মাথার উপর আসলে তিনি পদ্মপুকুর পাড়ে পূর্ণিমা উৎসবে যাবেন। কোথা থেকে এসে রাজ্যের ক্লান্তি প্রসন্ন বাবুর শরীরে ভর করে। বাবু ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েন।

কি কাল ঘুম নেমে এসেছিল বাবুর দু'চোখে!

পরিদের কথা অমান্য করায় ওরা এসে বাবুকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়। প্রসন্ন বাবুকে পরিরা গুম করে ফেলে। তাকে আর কোথাও পাওয়া গেল না।

পদ্মপুকুরের একটা পরিবর্তন সেদিন হয়েছিল।

পদ্মপাতা আর নানান শাপলা-শালুকে পুকুরের সব পানি ঢাকা পড়ে যায়। বাগানের সব গোলাপও নাকি উধাও হয়ে যায়। তালগাছ একটা থেকে দুটো হয়ে যায়। বাবুর বাড়ির লোকেরা সে শোক ভুলতে না পেরে এক অমাবস্যার রাতে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বাড়িটা এখন মত্যা রাজাকারের ছোটো বউয়ের দখলে।

তবে, এখনও পূর্ণমাসির রাতে নাকি পদ্মপুকুরে পরিরা আসে। উৎসব করে। মেলা বসে। জোড়া তালগাছ খাবার পাঠায়। পরদিন সকালে ভাঙা মেলার কিছু চিহ্ন কানুগাঁও'এ মানুষগুলোর চোখে পড়ে।

ভরদুপুরে কিংবা রাতদুপুরে তারপর থেকে পদ্মপুকুরের জোড়া তালতলায় কেউ যায় না। তাল পাড়তে গাছে ওঠে না। জোড়া তালগাছ কখনও কখনও একটা হয়ে যায়।

তাল কুড়ানিরাও ওমুখো হয় না।

কানুগাঁও'র মানুষগুলো পারতপক্ষে বড়ো পুকুর পাড়ের জোড়া তালতলায় যায় না।

মত্যা রাজাকারের ছোটো ভাই দেল্যা রাজাকার। একাত্তরে সংগ্রামের সময়ে এক দুপুরে বীরত্ব দেখাতে নাকি ওই তালগাছে উঠতে গিয়েছিল। অর্ধেক ওঠার

পর কে যেন গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেয়। গাছ থেকে পড়ে অচৈতন্য অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ পড়েছিল।

লোকে বলে, একটা তালগাছে প্রসন্ন বাবুর অশরীরি আত্মা বসবাস করে।

বাবানকে পদ্মপুকুরের জোড়া তালগাছের এই গল্প টুটুন বলেছে। টুটুন শুনেছে দাদানের কাছে। দাদান শুনেছে তাঁর ঠাম্মার মুখে। ঠাম্মাকে বলেছে ঠাম্মার বাবা। ঠাম্মার বাবা ছিল প্রসন্ন বাবুর ছায়াসঙ্গী জগবন্ধুর ছেলের সহপাঠী। ওর মুখে ঠাম্মার বাবা শুনেছে।

টুটুন বাবানের বাবু কাকার ছেলে। গ্রামে থাকে। ষান্মাসিক পরীক্ষা শেষে বাবান গ্রামের বাড়ি এসেছে। কানুগাঁও বাবানের দাদার বাড়ি।

বাবান বিস্ময় প্রকাশ করে আবার জানতে চাইল, তাহলে একটা তালগাছ কেউ লাগায়নি।

টুটুন বলল, না।

তাল বাবানের খুব প্রিয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তালগাছ কবিতা পড়ে বাবান তালের ভক্ত হয়ে যায়।

টুটুনকে বাবান বলল, পদ্মপুকুর পাড়ে জোড়া তালগাছ দেখতে যাব।

টুটুন নিষেধ করে। ভয়ের কথাগুলো আবার বলে।

বাবান শহরের ছেলে। অশরীরি আত্মা কিংবা ভূতের ভয় করে না।

শ্রাবণের শেষ ভাগে বাবান বাড়ি এসেছে। চারদিক পানিতে থইথই করছে। ভরা শ্রাবণের বিকালে পদ্মপুকুরের জোড়া তালগাছ দেখতে যায় বাবান। জোড়া তালগাছে অনেক তাল দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বাবান বলল, ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই তালগাছ। এক

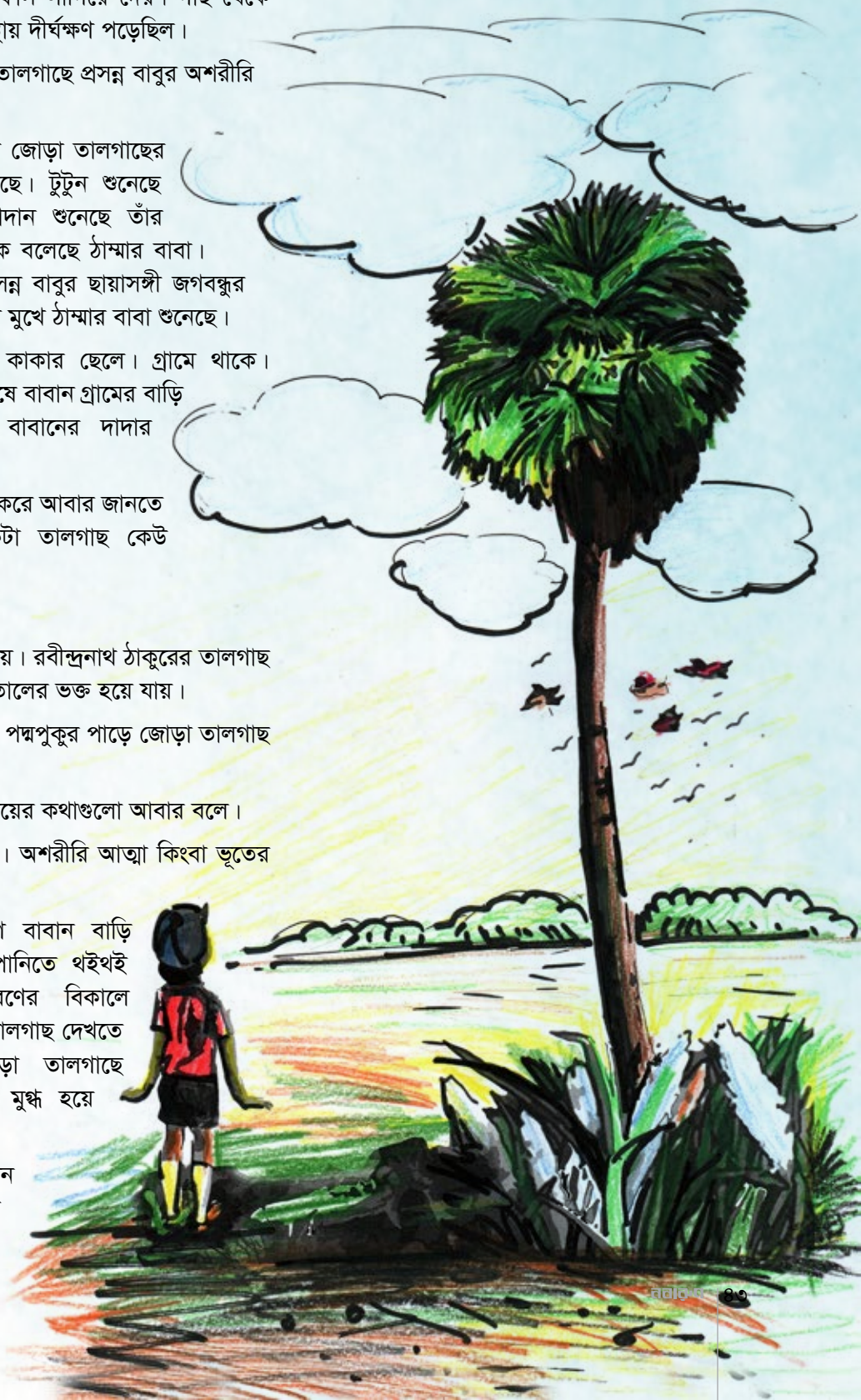

মুজতানিবা মোজাহিদ, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে।

টুটুন বলল, রাতে তাল ঝরে পড়ে।

বাবান বলল, আমরা সে তাল কুড়াবো।

টুটুন কিছু একটা বলতে যাবে।

বাবান তখন বলল, আজ রাতে আমরা তাল কুড়াতে যাব।

সন্ধ্যায় এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। পথঘাট কর্দমাক্ত। তবুও বাবান যাবে।

মধ্যরাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে, মাথার উপরে একফালি চাঁদ তখনও রূপালি দুধের নহর ঢেলে যাচ্ছে। বাবান টুটুনকে নিয়ে বেরিয়ে যায় সেই জোৎস্না রাতে। পদ্ম পুকুরপাড়ে গিয়ে টুটুন থমকে দাঁড়ায়।

একি কাণ্ড! টুটুন বলল।

বাবান বলল, কী হলো?

ওই দেখো তালগাছ। টুটুন বলল।

বাবান বলল, একি? একটা কেন? আরেকটি তালগাছ কোথায়?

টুটুন বলল, আমারও প্রশ্ন। আরেকটি কোথায়?

ওরা অনেকভাবে দেখল।

জোড়া তালগাছ দেখল না। একটা তালগাছ।

এবার বাবান ভয় পেল। টুটুনও ভয় পায়। দুজন কেউ কাউকে কিছু বলল না।

টুটুন মনে মনে ভাবল, এ নিশ্চিত তাল ভূতের কাণ্ড।

বাবান হারবার পাত্র নয়।

পরদিন সকালে সে আবার ওখানে গেল। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখল।

ঠিকই।

ওখানে দাঁড়ালে তালগাছ একটাই দেখা যায়।

বাবান হো হো করে হেসে ওঠে।

টুটুনও হো হো করে হাসল। ❑

কর্মকর্তা, এসো শিখি প্রজেক্ট, ইউএসআইডি

গল্প

মোবাইল ম্যানিয়া

নাজমুল হুদা

কদিন আগেও জিনিয়া জ্বরে কো কো করছিল, এখন জেদ ধরে আছে তাকে মোবাইল ফোন কিনে দিতে হবে। তাও আবার স্মার্টফোন। এতটুকু মেয়ের মাথায় এহেন চিন্তা ঢুকল কীভাবে? এ চিন্তায় মা আফরোজা বেগমের মাথায় হাত। কপালে ভাঁজ পড়েছে।

জ্বর সেরে ওঠার পর জিনিয়া এখন বেশ সুস্থ। কিন্তু ইদানীং তার আচরণে জেদি একগুয়ে ভাব। বোকা বোকা প্রশ্ন করে আগে যেমন সবাইকে তটস্থ করে রাখত এখন আর তা করছে না। কারো কথা শুনছেও না। হক মামার কথা হয়ত শুনবে। সে আশায় মা মামাকে আসতে বলেছেন। হক মামা এসে জিনিয়াকে শান্ত করবে কি উলটো সে মামাকেই অশান্ত করে তুলছে! জিনিয়া বেশ দাবি নিয়ে বলল 'মামা, তোমার মোবাইলটা দাও তো'।

‘কেন, কী করবি’?

‘দাও না, তারপর বলছি’।

হক সাহেব কিছু না বলে পকেট থেকে মোবাইল বের করে জিনিয়ার হাতে দিল। জিনিয়া তো রেগে আগুন।

‘এটা কী দিলে? তোমার স্মার্টফোন কোথায়?

‘স্মার্টফোন? আমি তো বাটন ফোন ব্যবহার করি’।

‘ওহ মামা, তুমি তো ব্যাকডেটেড রয়ে গেলে, এখন আর কেউ এসব ফোন রাখে? এই ফোনে কথা বলা ছাড়া আর কী করা যায় বলো তো?

‘ফোন দিয়ে কথা বলা ছাড়া আর কী করার আছে?

‘মামা, তুমি এত কিছু জানো, আর এগুলো জানো না, ফান করছ?’

‘ফোন নিয়ে ফান করব কেন? এটা তো দরকারি জিনিস’।

‘তোমার ফোন আমার দরকার নেই মামা’, মুখ ঘুরিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল জিনিয়া। হক সাহেব জিনিয়ার সিরিয়াস টাইপের কথা শুনে থ হয়ে গেলেন! শান্ত-শুভ্র মেয়েটা কেমন যেন পালটে গেছে। কথার স্বরও ঝাঁঝালো। হক সাহেব আয়েশ করে বিছানায় গা এলিয়ে ভাবতে লাগলেন-কী কারণ হতে পারে, কী করা যায় ইত্যাদি। কেসটা আসলে সাধারণ হলেও সহজ না। সমাধান করতে জিসানের সাহায্য লাগবে। আপার সাথেও কথা বলা জরুরি। আফরোজা বেগম মুখ ভার করে ভিতরে এসে বসলেন। হক সাহেব হাসি হাসি মুখ করে বললেন ‘আপা বলো তো তোমরা কী এমন করেছ যে জিনিয়া এরকম বিগড়ে গেল?’

‘কী করেছি মানে, আমি কী করব? সব আমার দোষ, না? আফরোজা বেগম তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

‘না মানে কারণটা না জানলে তো আমি সমাধান দিতে পারব না’।

‘সমাধান তো ওর কাছে, ওকে জিজ্ঞেস করো?

‘তা তো করবই, আগে তোমার কথা শোনা জরুরি’।

‘তুই তো জানিস জিনিয়া কদিন খুব অসুস্থ ছিল। ওই সময় ঠিকমতো ঘুমাতো না, খেতে চাইত না। আমার মোবাইলটা দিলে খুশি হতো। ব্যস্ত থাকত। দেখতাম ওটা নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করত, এমনকি বালিশের পাশে রেখে শুয়ে থাকত।’

‘সর্বনাশ’।

‘এতে সর্বনাশের কী আছে! সব বাচ্চারাই তো এখন মোবাইল কোলে নিয়ে বড়ো হয়। আর ও তো বেশ বড়ো হয়ে গেছে। ভাবলাম কদিন পরে সুস্থ হলে ঠিক হয়ে যাবে’।

‘তারপর?

‘তারপর দেখি সে সুস্থ হয়েও কারণে-অকারণে মোবাইল চায়, আমারটা না পেলে ওর বাবারটা খোঁজে। স্কুল থেকে ফিরেই মোবাইলের বায়না, ঘুম থেকে উঠেও মোবাইল। হোমওয়ার্কে মন নেই। বাধ্য হয়ে মোবাইলটা লক করে রাখলাম, ডাবল লক। বার বার নক দিয়েও না পেয়ে সে নতুন দাবি তুলল ওকে মোবাইল কিনে দিতে হবে’।

‘যৌক্তিক দাবি’।

‘যৌক্তিক দাবি মানে? এতটুকু পুঁচকে মেয়ে স্মার্টফোন চায় আর তুই বলছিস যৌক্তিক দাবি’।

‘আপা তোমার ওসব যুক্তি জিনিয়া বুঝবে না, শিশুদের মন এবং দেহ চারপাশের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত, সেলফোন বিকিরণ তাদের দুর্বল করে তোলে। যেহেতু সেলফোন থেকে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি-ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন বিকিরণ হয় আর মানুষের মস্তিস্ক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণের প্রতি সংবেদনশীল’।

‘তোর কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছি না, তুই লেকচার না দিয়ে আসল কথাটা বল’।

‘আসল কথাটা হলো এটা একটা রোগ বলতে পারো, একে বলে মোবাইল ম্যানিয়া। এখন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে এ রোগ। শিশুরা টিভি দেখতে, গেম খেলতে, ফোন কল করতে, টেক্সট মেসেজ পাঠাতে সেলফোন

ব্যবহার করছে। অনেক বাচ্চাদের এবং কিশোর-কিশোরীদের নিজস্ব সেলফোন রয়েছে। অধিকাংশই স্মার্টফোন। এগুলো ব্যবহার করে বাচ্চারা কিন্তু স্মার্ট হয় না। বরং পিছিয়ে পড়ে; ঝিমিয়ে পড়ে।'

মা মামার কথার মাঝে ভাগনে জিসান হাজির হলো। চোখে-মুখে কৌতূহল। শেষের কিছু কথা বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনেছে সে। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে বসল 'মামা মোবাইল ম্যানিয়া হয়েছে বুঝব কীভাবে'?

'এক কথায় বলা কঠিন, জানা জরুরি। ব্যক্তি বিশেষে পার্থক্য হলে সাধারণ কিছু বিষয় লক্ষ্য করা যায়। যেমন: মাঝে মাঝেই মনে হয় ফোন বা মেসেজ আসছে। ভুল বুঝতে পারার কিছুক্ষণ পরে আবারও মনে হবে, ফোন খুঁজে না পেলে হঠাৎ যেন হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। মনে হবে, অনেকটা হার্ট অ্যাটাকের মতো হয় আর কী, ...আরে ফোনটা কী হলো, কোথাও গিয়ে সবার আগে প্রশ্ন আসে-ফোনে চার্জ দেওয়ার জায়গা কোথায় আছে, দিনের কোনো সময় ফোন খারাপ হয়ে গেলে আপনার মেজাজ বিগড়ে যায়, কোনো দরকার ছাড়াই দিনে অনেকবার কথা বলা, সকালে ঘুম থেকে উঠেই সবার আগে ফোনটা ভালো করে চেক করে নেওয়ার প্রবণতা, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, বা বাসে দাঁড়িয়েও হোয়াটসঅ্যাপ-ফেসবুক চ্যাট বা মেসেজ পাঠানো, ফোনে সিগন্যাল নেই তবু সারাক্ষণ ফোন ঘাঁটাঘাঁটি, এমনকি দিনে যতবার ফোনের দিকে তাকাচ্ছেন, ততবার মানুষের দিকে না তাকানো।'

জিসানের মাথা ঝিমঝিম করছে। কিছুটা মেলাতেও পারছে। তার কয়েকজন বন্ধুরও মোবাইল আছে। এগুলোর মধ্যে অনেক লক্ষণই মিলে যাচ্ছে। শুধু জিসান না আফরোজা বেগমও কিছু মিল পাচ্ছেন মোবাইল ব্যবহারে। জিনিয়ার মধ্যে অনেকগুলো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিছুদিন ধরেই। শুকনো মুখে আফরোজা বেগম বলে উঠলেন 'হক, তাহলে তো এ সমস্যা এখন ঘরে ঘরে'।

'জি আপা, হাতে হাতে স্মার্টফোন থাকলে তো মোবাইল ম্যানিয়া ঘরে ঘরে ছড়াবেই'।

'তাহলে কী করণীয়, বাচ্চারা তো সব আসক্ত হয়ে যাবে'।

‘উপায় এই বাটন ফোন’ হক সাহেব নিজের ফোনটা দেখিয়ে বলে হেসে উঠলেন।

‘কিন্তু মামা স্মার্ট ফোন দিয়ে তো আমরা অনেক দরকারি কাজ করি, ইউটিউব দেখি, নেট ঘেটে অনেক কিছু শিখি’।

‘অবশ্যই জিসান, প্রয়োজন হলে অনেক জানা যায়, হাতের মুঠোয় পুরো বিশ্ব থাকে। কিন্তু আমাদের প্রবণতাই হলো একটা খুঁজতে গিয়ে আরেকটা দেখা, বিশেষ করে অল্প বয়সি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এই আশঙ্কা আরো বেশি। এভাবে এটি ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক জগতকে এড়িয়ে তার চিন্তা ও কল্পণাশক্তিকে স্মার্টফোনের রঙিন পর্দার গতিতে আটকে দেয়। এভাবে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়।’

‘তাহলে তো সবার আপডেট পাবো না’।

‘সবার আপডেট সব সময় আমাদের প্রয়োজন হয় না। সবার খবর, স্ট্যাটাস দেখতে গিয়ে আমরা নিজের কাজে মনোযোগ দিতে পারি না। তাছাড়া এটাও একটা রোগের মতো। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের সাথে সংযুক্তি হারানোর ভয়কে বলা হয় ‘নোমোফোবিয়া’। এজন্য আমার কিছু দরকার হলে ট্যাব বা ল্যাপটপে চলে যাই’।

‘হক তোর এসব তত্ত্ব তরিকা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না-এখন কী করা যায় সেটা বল’।

‘এই তো কাজের কথা বলেছ আপা, আমার কথা তো তোমরা দাম দাও না। আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিক্স (এপিপি) এর পরামর্শ হলো ১৮ মাসের কম বয়সি শিশুদের জন্য, ভিডিও-চ্যাটিং ব্যতীত মোবাইল ব্যবহার একদম না। ২ থেকে ৫ বছর বয়সি শিশুদের জন্য, বাছাইকৃত প্রোগ্রামগুলোর জন্য প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১ ঘণ্টা সময় বেধে দিতে হবে।’

‘ওরা কি ধরা-বাধা মানে, কিছু একটা না পেলে আবার ঝুঁকে যাবে মোবাইলে’।

‘এই তো বাস্তব কথা বলেছ। কিছু একটা করবে তবে সেটা যাতে ক্ষতি বা আসক্তির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়-বই পড়বে, খেলাধুলা করবে।

আফরোজা বেগম মেনে না নেওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, ‘এখনকার বাচ্চারা কি বই পড়তে চায়, সবাই তো মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকে’।

‘ভুল কথা আপা, বই পড়াও এক ধরনের নেশা, সেটা ধরানোর দায়িত্ব আমাদেরই। দেখো আপা এই যে মার্ক জাকারবার্গ ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা তিনিও তো দুই সপ্তাহে একটি বই পড়েন। বিল গেটস তো সপ্তাহে দুইটি পড়ার চেষ্টা করে। আর আমরা মোবাইল নিয়ে মত্ত!

‘আসলেই হক, আমাদের দেখা দেখিই ওরা আসক্ত হয়ে পড়ছে, আগে নিজেদের মোবাইল ব্যবহার নিয়মে আনতে হবে’।

‘সেটা তো করবেই আপা, কিন্তু আপাতত জিনিয়াকে ফেরাও।

‘কীভাবে, সেটাই তো তোকে জিজ্ঞেস করছি’।

‘তুমি রেডি থাকো, আজ বিকেলেই এক জায়গায় যাব।

‘কোথায়?

‘শোনো আপা, শহরে অনেক বুকশপ, বুক ক্যাফে আছে ওখানে নিয়ে যেতে হবে। ওরা ইচ্ছেমতো বই দেখবে, কিনবে, পড়বে-আস্তে আস্তে নেশা তৈরি হবে’।

‘বাহ দারুণ আইডিয়া তো।

‘শুধু তাই না, সপ্তাহে একবার ওদের বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে নিয়ে যাও-শিখবে, জানবে, ভাববে।

‘এজন্য তো তোকে দরকার হক।

কাউকে দরকার নেই আপা, আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজেদের সন্তান, শিক্ষার্থীদের এভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারি দেখবে এমনিতেই মোবাইল ম্যানিয়া দূর হবে। শিশুরা শুরু থেকেই সৃজনশীল হয়ে উঠবে’। ❑

প্রাবন্ধিক, গবেষক ও যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

পান্তাভাত কথন

হাফিজুর রহমান

ভাত যাদের প্রধান খাদ্য, পান্তা তার কাছে পরিচিত। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পান্তা খাওয়ার সংস্কৃতি চালু আছে। যেহেতু ভাত প্রধান খাদ্য, তাই দৈনিক অন্যান্য খাবারের তুলনায় এটিই একটু বাড়তি করে রান্না করা হয়। আবার দিন শেষে যখন সেই বাড়তি ভাতের কিছুটা বেঁচে যায়, তখন সেটা সংরক্ষণেরও প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু প্রাচীনকালে সংরক্ষণ ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। তাই সবচেয়ে সহজ উপায় হিসেবে মানুষ বাড়তি ভাতে পানি ঢেলে পান্তা করার প্রচলন শুরু করে। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা অত্যন্ত বেশি হওয়ায় ভাত বেশিক্ষণ রেখে দিলে তা পচে খাবার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। কিন্তু পানি দিয়ে রাখলে গাজনকারি ব্যাক্টেরিয়া সেখানে ল্যাকটিক এসিড তৈরি করে যার ফলে পান্তাভাতের অম্লত্ব বেড়ে যায় (pH কমে)। তখন পচনকারি ও অনান্য ক্ষতিকারক ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক ভাত নষ্ট করতে পারে না।

পান্তা বাংলাদেশের বাইরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, অন্ধপ্রদেশ ও কেরালায় খাওয়া হয়। তবে অঞ্চল ভেদে পান্তাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন- আসামে পান্তাভাতকে পঁইতা (Poita) ভাত বা পন্তা (Ponta) ভাত বলে; উড়িষ্যায় পোখালো (Pokhalo), আর তামিলনাড়ুতে প্যাযায়সাদাম (Payhayasaddam), ইন্দোনেশিয়ায় তাপাই, থাইল্যান্ডের খাও মাক। এছাড়া মিয়ানমার, ও চীনে পান্তার মতো খাবারের প্রচলন আছে, যা তৈরির প্রক্রিয়া যেমন ভিন্ন, স্বাদও তেমন ভিন্ন। ভিয়েতনাম, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ুতে এখনো সকালে পান্তা খাওয়ার প্রচলন আছে। আমাদের গ্রামেগঞ্জেও আছে। জাপানে এক জাতের মাছ ছয় মাস ভাতের মধ্যে ফারমেন্টেড করে খাওয়ার একটি উৎসব হয়। এটি ওদের সবচেয়ে পুরনো উৎসবের একটি। পান্তাভাতের ইতিহাস আনুমানিক ২০০০ বছরের পুরনো হলেও কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, মুঘল আমলে এ খাবারের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। সেসময় বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আগত দর্শক শ্রোতাগণকে পান্তা খেতে দেওয়া হতো। আর বিংশ শতাব্দীতে এসে পান্তভাত নববর্ষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায়। আর এখন তো পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ খাওয়া সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পান্তাভাত এতই জনপ্রিয় যে যুগে যুগে একে নিয়ে অনেক প্রবাদ-প্রবচন রচিত হয়েছে। তবে বাংলার লোকসাহিত্যে পান্তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় আজ হতে প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে বিজয়গুপ্ত রচিত মনসামঙ্গল বা পদ্মপুরাণে। কবি লিখেছেন- 'আনিয়া

মানের পাত বাড়ি দিল পান্তা ভাত।' এখানে মান বলতে মানকচু বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানকচুর পাতায় পান্তাভাত বেড়ে খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আবার মধ্যযুগের কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও আছে পান্তার উল্লেখ। 'পাঁচ মাসে নিদায়ার না রোচে ওদন ছয় মাসে কাজী করঞ্জায় মন।' উল্লেখ্য এখানে 'কাজী' বলতে পান্তাভাতকেই বোঝানো হচ্ছে। আবার একই কাব্যের 'কালকেতুর ভোজন' অংশে কবি লিখেছেন- 'মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে এক শ্বাসে সাত হাড়ি আমানি উজাড়ে চারি হাড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ ছয় হান্ডি মুসুরি সুপ মিশ্যা তথি লাউ।'

আর এখানেই আমরা খুঁজে পাই নববর্ষ উদযাপনের সাথে পান্তার সম্পর্ক। আমানি হলো মূলত পান্তাভাতের জলীয় অংশ। আর এই আমানি এই অঞ্চলের নববর্ষ পালনের এক প্রাচীন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের উপাদান। বলা যায়, এই অঞ্চলের নববর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন আয়োজনই হলো আমানি। এটি মূলত চৈত্রের সমাপ্তি কিংবা বৈশাখের শুরু উপলক্ষে কৃষক পরিবারের নিজস্ব আয়োজন। চৈত্র সংক্রান্তির সন্ধ্যারাতে গৃহকর্ত্রী আমানি প্রস্তুতির আয়োজন করতেন। এক হাঁড়ি জলে কিছু অপক্ক চাল ছেড়ে তা সারারাত ভিজতে দিতেন এবং সেই হাঁড়ির মাঝেই কচি আমপাতা যুক্ত ডাল বসিয়ে রাখতেন। পহেলা বৈশাখের ঠিক পূর্ব প্রহরে, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বেই ঘুম থেকে উঠে ঘর ঝাড়ু দিয়ে গৃহকর্ত্রী সেই হাঁড়ির জল সারা ঘর ও উঠোনে ছড়িয়ে দিতেন। এরপর সেই ভেজা চাল সকলকে খেতে দিতেন এবং কচি আমপাতা হাঁড়ির জলে ভিজিয়ে বাড়ির সকলের শরীরে ছিটিয়ে দিতেন। এবার পান্তাভাত নিয়ে জানাচ্ছি একটা গল্প। আর গল্পটা হলো ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে নিয়ে। ১৭৫৬ সালের এপ্রিল মাস। তখনও বাংলায় নবাবের শাসন চলছে। হেস্টিংসের বয়স তখন মাত্র চব্বিশ, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কর্মরত। তৎকালীন নবাব আলিবর্দি খানের মৃত্যু হলে তাঁর পৌত্র সিরাজউদ্দৌলা বসলেন মুর্শিদাবাদের মসনদে। শুরু থেকেই সিরাজ ইউরোপীয়দের উপর নানা কারণেই বিরক্ত ছিলেনে। সেই জের ধরে তিনি একবার হেস্টিংসসহ বেশ কিছু ব্যবসায়ীকে গ্রেফতারই করে ফেললেন। একদিন সুযোগ বুঝে কৃষ্ণকান্ত নন্দী নামক এক পূর্বপরিচিত বাঙালি ব্যাবসায়ীর সাহায্যে হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন ফুলতা দ্বীপে কৃষ্ণকান্তের বাড়িতে। এদিকে বাংলার মাত্রাতিরিক্ত আর্দ্র গরম আবহাওয়া তার অবস্থাকে আরো শোচনীয় করে তুলে। সব মিলে হেস্টিংসের যায় যায় অবস্থা। কৃষ্ণকান্তের বাড়িতে সেদিন হেস্টিংসের মতো ইংরেজ সাহেবকে খেতে দেওয়ার কিছুই ছিল না। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা দেখে কান্তবাবু বুদ্ধি করে তাকে একটি কলাপাতায় পান্তা ভাত, ভাজা চিংড়ি এবং কাঁচা পেঁয়াজ খেতে দিয়েছিলেন। আর এভাবেই পান্তা খাইয়ে হেস্টিংসের প্রাণরক্ষা করেছিলেন কৃষ্ণকান্ত বাবু।

হেস্টিংস এর প্রাণ রক্ষাকারী পান্তা ভাত বা ফারমেন্টেড রাইসকে এখন বলা হচ্ছে সেকালের সুপারফুড। কী এমন আছে পান্তাভাতে, যার কারণে এটা অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ খেয়ে আসছেন? জেনে নেওয়া যাক পান্তাভাত সুপারফুড হিসেবে কেন পরিচিত—

১. পান্তা ভাতে আয়রনের পরিমাণ বাড়ে ২১ গুণ যা আয়রন ডিফিশিয়েন্সি কিংবা এনিমিয়া বা রক্তশূন্যতা কমায়

২. মাত্র একশ গ্রাম পান্তা ভাতে প্রায় তিন ট্রিলিয়ন ভালো ব্যাকটেরিয়া থাকে। যার কাজ হলো শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে উন্নত করা

৩. এতে পটাসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম এর পরিমাণ এমনভাবে বাড়ে যা একজন স্বাভাবিক মানুষের দৈনিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত।
৪. গরম ভাতে যে পরিমাণ ফ্যাট থাকে পান্তাভাতে তা প্রায় ৬ গুণ কমে যায়

৫. পান্তা ভাতকে বলা হয় ন্যাচারাল কুলার। শরীরের টেম্পারেচার নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে

৬. নিয়মিত পান্তা খেলে সবরকম আলসার সেরে যায়

৭. ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়

৮. পান্তা নিদ্রাহীনতা দূর করে

৯. সকালের পান্তা সারাদিনের জন্য কর্মক্ষম রাখতে সাহায্য করে।

ভেতো বাঙালির পান্তাকে ছোটো করে দেখার কিছু নেই। অনেক বড় বড় দেশ এখন পান্তাভাতকে সুপার ব্রেক ফাস্ট হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। ❑

লেখক ও গবেষক

হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে মিষ্টি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। পালা-পার্বণ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসবে মিষ্টিমুখ করানোর চল এ দেশের অনেক পুরাতন ঐতিহ্য।

হাতে এক প্যাকেট মিষ্টি ছাড়া কি বাঙালি আত্মীয়ের বাড়ি যেতে পারে? বৈশাখের প্রথম দিনে ,হালখাতা, ঈদ, পূজা-পার্বণ বা বিয়েশাদি ,পরিবারে নতুন শিশুর আগমন বা পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ যা-ই বলুন; মিষ্টি ছাড়া কি পরিপূর্ণ হয়? মিষ্টি মুখ করার দীর্ঘদিনের এই রেওয়াজ রয়েছে দেশের বিভিন্ন এলাকা ও গ্রামাঞ্চলে। সেই সাথে বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলভেদে মিষ্টান্নের হরেক রকম স্বাদ ও ধরন রয়েছে। নামে-রঙে-স্বাদে বৈচিত্র্যময় কত মিষ্টিই আমাদের কারিগরেরা তৈরি করেন দেশের প্রতিটি প্রান্তে। দু-চারটি জেলার কিছু মিষ্টির নাম তো সারা দেশের মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী এসব মিষ্টির সন্ধান ও স্বাদের খোঁজেই প্রথমবারের মতো 'জাতীয় মিষ্টি মেলা ২০২৪'-এর আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন মিষ্টির সমাহার নিয়ে দেশে প্রথমবারের ব্যতিক্রমধর্মী এই মেলা বুধবার (০৬ই মার্চ) শুরু হয়ে রোববার (১০ই মার্চ) বিকাল পর্যন্ত চলেছে। টানা পাঁচ দিন ধরে চলা এ মেলা ভোজন রসিক ও মিষ্টান্ন প্রেমিকদের আগমনে পূর্ণতা পেয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজক সংশ্লিষ্টরা। আয়োজকরা আরো জানান, দেশের ৬৪ জেলা থেকে ৬৪টির বেশি মিষ্টির স্টল একাডেমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নিয়ে বসেছিলেন মিষ্টি শিল্পীরা। সাথে ছিল লোক-সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে মিষ্টিমেলার উদ্‌বোধন করেন সংস্কৃতি সচিব খলিল আহমেদ। প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পী হাশেম খান। লিয়াকত আলী লাকী জানান, এই মিষ্টি উৎসবে যেসব শিল্পীরা মিষ্টি উৎপাদন করে, তাদেরও চিহ্নিত করতে চাই। আমাদের অনেক মিষ্টির জিআই হয়েছে, আরও যেসব হওয়া উচিত, তা নিয়ে কাজ করব।'

এ দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে আছে বিভিন্ন রকম মিষ্টি। কুমিল্লায় আছে এক রকম, রাজশাহীতে আরেক রকম। প্রতিটি মিষ্টির আছে আলাদা বৈচিত্র। বাঙালির জীবনে মিষ্টিমুখ ছাড়া কোনো শুভকাজ যেন সমাপ্ত হয় না। মিষ্টির এই প্রচলন থেকেই দেশে এলাকাভেদে একেক অঞ্চলের মিষ্টির সুখ্যাতি রয়েছে। ঐতিহ্য হিসেবেও মিষ্টির ইতিহাস দুই থেকে আড়াই শ বছরের। মিষ্টি অন্যতম একটি মাধ্যম যা আমাদের খাদ্য সংস্কৃতির সাথে মিশে আছে। সে কারণে সেই

ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলার মিষ্টি জগৎ জোড়া নাম লিখিয়েছে নানান রকম মিষ্টি। ক্ষীরকদম, সন্দেশ, দই, গোলাপজাম, রসগোল্লা, মতিচুরের লাড্ডু, কেশর কালাকাধ, মালাই চমচম, সাতক্ষীরার সন্দেশ, নলেন গুড়ের সরপুরি , প্যাড়া, দ্বীপজেলা ভোলার মহিষের দুধের টক দই, চাঁদপুরের মতলবের বিখ্যাত ক্ষীর, চট্টগ্রামের সাদা মিষ্টি, মনসুর, আফলাতুন, কুমিল্লার রসমালাই, টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম, ঢাকার বাকরখানি, বুনদিয়া, নবাবগঞ্জের স্পঞ্জ রসগোল্লা, বাতাসা, রাজবাড়ির চমচম, গোপালগঞ্জ রসগোল্লা, খুলনার সুন্দরবনের মধু, পুড়ের সন্দেশ, পুড়ের গজা, যশোরের খেজুরের গুড়, জামতলার মিষ্টি, পাটালী, কুষ্টিয়ার তিলের খাজা, মেহেরপুরের সাবিত্রি মিষ্টি, রসকদম, পাবনা ও নওগাঁর প্যারা সন্দেশ, নাটোরের কাঁচা গোল্লা, বগুড়ার দই, ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার মন্ডা, কৃষ্ণা কেবিনের মালাইকারীসহ হরেক রকমের মিষ্টি ও মিষ্টান্ন বাঙালির ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে। এগুলো কেবল দেশেই নয় সুনাম ছড়িয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও।

দেশের জিআই পণ্য হিসেবে মিষ্টান্নের মধ্যে এরই মধ্যে নিবন্ধন পেয়েছে নাটরের কাঁচাগোল্লা এবং কুষ্টিয়ার তিলে খাজা, টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম, কুমিল্লার রসমালাই।

আজকার যুগের ছেলেমেয়েরা ফুচকা আর ফাস্ট ফুডের পাশাপাশি মিষ্টি সর্ম্পকে জানাতে আর চেখে দেখার সুযোগ নিতে ভিড় করেছিল মিষ্টিমেলার প্রাঙ্গণে। পুরাতনের চেয়ে নতুন প্রজন্মের আগমন ছিল চোখে পরার মতো। মিষ্টিমেলায় আসা এক শিক্ষার্থী জানান, ‘এত ধরনের মিষ্টি আছে, সেটাই তো জানা ছিল না। মিষ্টি চেখে দেখছি, পাশাপাশি এগুলো সম্পর্কে জানতেও পারছি।’

১০ই মার্চ (রোববার) সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মুক্তমঞ্চে আয়োজিত হয় মিষ্টি মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। আয়োজিত অনুষ্ঠানে সকল অংশগ্রহণকারী মিষ্টি শিল্পীদের প্রদান করা হয় সনদপত্র ও ক্রেস্ট।

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার পেলেন বিশেষ শিশু

প্রতি বছর ঈদকে ঘিরে প্রধানমন্ত্রীর ঈদকার্ড করা হয়। এ ঈদকার্ডে স্থান পায় দেশের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের আঁকা ছবি। সে হিসেবে প্রতিবন্ধী শিশু সুবর্ণা আক্তার প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটি আঁকা ছবি ২০২২ সালে পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়। সুবর্ণার আঁকা সেই ছবি ঈদকার্ডে স্থান না পেলেও প্রধানমন্ত্রী পছন্দ হয়। তিনি সুবর্ণাকে এক লাখ টাকার অর্থ পুরস্কার দেন।

এবছর ১০ই মার্চ পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক জহুরুল ইসলাম তাঁর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া এক লাখ টাকার চেক সুবর্ণা ও তার বাবা সফিউল আলমের হাতে তুলে দেন। সুবর্ণা বোদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। সে চার ভাই-বোনের মধ্যে তৃতীয়। ছোটোবেলা থেকেই হাঁটতে ও কথা বলতে সমস্যা। বিশেষ শিশু হয়েও সে ছবি আঁকতে পছন্দ করে।

২০২২ সালে বোদা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়াশোনার সময় প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটি ছবি এঁকে ইউএনওর কাছে জমা দিয়েছিল সুবর্ণা। ওই সময় ঈদকার্ড তৈরির জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সারা দেশের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ছবি সংগ্রহ করা হচ্ছিল। তখন সুবর্ণার ছবিটিও পাঠানো হয়েছিল। ছবিটি ঈদকার্ডে স্থান না পেলেও ছবিটি প্রধানমন্ত্রীর পছন্দ হওয়ায় সুবর্ণার নামে এক লাখ টাকা বরাদ্দ দেন। সুবর্ণার বাবাকে ফোন করে জানানো হয়। কিন্তু তিনি কোনো খোঁজ নেননি। এক সময় চেক ফেরত চেলে যায় প্রধানমন্ত্রীর দফতরে। পরবর্তীতে সেই চেক আবার রি-ইস্যু করে তুলে দেওয়া হয় সুবর্ণার হাতে।

সুবর্ণার বাবা বলেন, 'আমি গরিব মানুষ। ডিসি অফিস থেকে আমাকে ডেকে চেক দিল। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই।'

প্রতিবেদন : মো. নাজমুল হোসেন

শিশুর কিডনি রোগে সচেতনতা

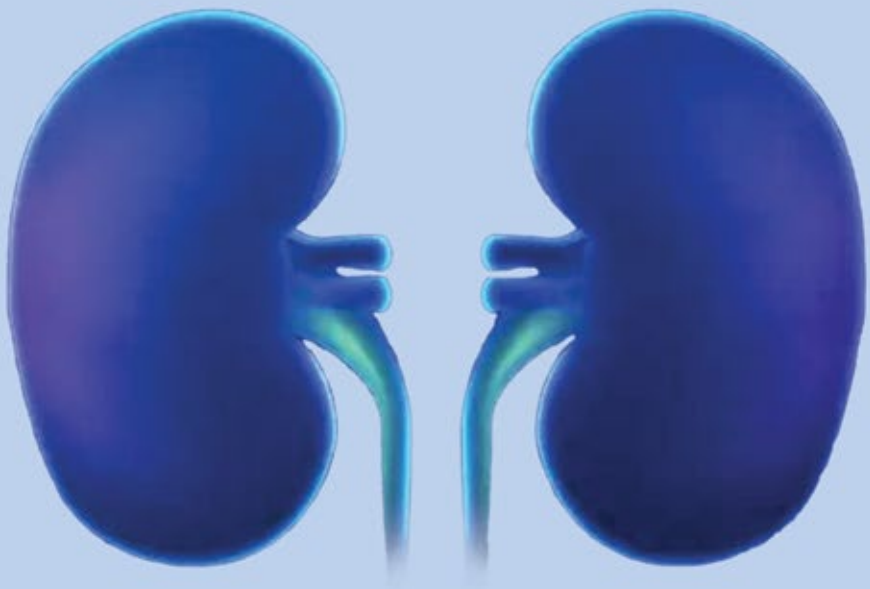

রক্তের মধ্যে জমে থাকা দূষিত পদার্থ বের করা ও প্রয়োজনীয় পদার্থ ধরে রাখা; শরীরের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা; বিভিন্ন হরমোন তৈরি করা ও তৈরিতে সাহায্য করা; রক্তের কণিকা তৈরিতে সাহায্য ও শরীরের হাড়কে সুস্থ রাখা ইত্যাদি কাজ করে কিডনি। প্রতিটি কাজই মানব শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিডনি সুস্থ না থাকলে এসব কাজে বিঘ্ন ঘটে ও শারীরিক বিপর্যয় দেখা দেয়। বিশেষ করে শিশুদের ঝুঁকি বেশি। যে-কোনো গুরুতর অসুখ অথবা ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কারণেও শিশুদের কিডনি সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই শিশুর কিডনির বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

শিশুর কিডনি রোগের লক্ষণ

ঘন ঘন প্রস্রাব করা, প্রস্রাবে ইনফেকশন হওয়া; ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করা, বিছানায় প্রস্রাব করা (৬ বছরের অধিক বয়সে), প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত যাওয়া, প্রস্রাবের সময় তলপেট/কোমর ব্যথা করা, শরীরে পানি আসা/ফুলে যাওয়া, প্রস্রাব কমে যাওয়া ইত্যাদি নানা উপসর্গ কিডনি রোগের দেখা দিতে পারে। কিডনিতে পানি জমা হওয়া, কিডনি ছোটো-বড়ো হওয়া, উচ্চরক্তচাপ দেখা দেওয়া, কিডনিতে জন্মগত ত্রুটি থাকা- পরিবারের কারও কিডনি রোগ থাকলে, শিশু সময়ের আগে জন্মগ্রহণ করলে অথবা জন্মের পর শিশুর ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় কম হলে দেরি না করে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। শিশুর জন্মগত কিডনি রোগ আলট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে ধরা পড়ে। মূত্রনালি ও মূত্রাশয়ের গঠনগত সমস্যা; মূত্রপথের ভাল্বের কার্যক্রমে বাধা; কিডনি থাকা না থাকা; বিভিন্ন আকারে অর্থাৎ ছোটো-বড়ো থাকা; ঠিক জায়গা মতো না থাকা; কিডনি ফোলা থাকা ইত্যাদি সমস্যা সম্পর্কে আলট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়।

শিশুর মূত্রনালির সংক্রমণ (ইউটিআই) শিশুদের অন্যতম প্রধান একটি রোগ। অনেক ক্ষেত্রেই এ রোগের সঠিক নির্ণয় ও চিকিৎসা নিয়ে অবহেলা করা হয়। ফলে বার বার সংক্রমণের দরুণ শিশুর কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে উচ্চরক্তচাপের ঝুঁকি বেড়ে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঠিক চিকিৎসার অভাবেই শিশুদের কিডনির কার্যকারিতা নষ্ট হয়।

এসব বিষয়ে অভিভাবকদের বেশি সচেতন থাকতে হবে। শিশুদের প্রস্রাবের সংক্রমণ অবহেলা না করে সঠিক সময়ে যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণে কিডনির রোগ প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহে রকেট

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় স্পেস সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শিক্ষার্থী নাহিয়ান আল রহমান তৈরি করেছে রকেট। পরীক্ষামূলক উড্ডয়নও হয়েছে কয়েকবার। আবহাওয়া সংক্রান্ত গবেষণার কাজে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে এই রকেট।

ছোটোবেলা থেকেই গাইবান্ধার তরুণ নাহিয়ান আল রহমানের আবিষ্কারের নেশা ছিল। এই নেশা আরো বাড়ে ২০১১-১২ সেশনে ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগে ভর্তির পর। চেষ্টা শুরু করেন রকেট তৈরিতে। রকেট তৈরির জন্য নাহিয়ান এবং তাঁর বন্ধুরা মিলে গঠন করেন আলফা সায়েন্স ল্যাব। প্রথমে তারা ওয়াটার রকেট তৈরিতে সফল হন। ওয়াটার রকেটটি অনেকটা খেলনার মতো দেখতে ছিল। এগুলো তারা ক্যাম্পাসেই উড্ডয়ন করেন। এর মধ্যে তারা রোবটিকস নিয়ে কাজ শুরু করেন। রোবটিকসে জাতীয়ভাবে চ্যাম্পিয়নও হন। এরপর ভারতের আইআইটি বোম্বে টেক ফেস্টে অংশ নিয়ে সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেতে সক্ষম হন।

এরপর অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০১৯ সালে গড়ে তোলেন ১৫ সদস্যের ধূমকেতু এক্স। ২০২১ সালে নাহিয়ান এবং তার দল সক্ষম হয় রকেট তৈরিতে। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে তারা রকেটটি উৎক্ষেপণের জন্য জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করেন।

অবশেষে ফল পেলেন 'রকেট্রি ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ'-এর মাধ্যমে। ২০২২ সালের নভেম্বরে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের এটুআই প্রজেক্ট আয়োজিত রকেট্রি চ্যালেঞ্জে ১২৪টি দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে 'ধূমকেতু এক্স' লাভ করে ৫০ লাখ টাকার অনুদান। এই অর্থের চার ভাগের এক ভাগ টাকা তারা এরই মধ্যে পেয়েছে, যার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে ধূমকেতু ১, ২, ৩, ৪ এবং রকেট একুশ। ২০২৩ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারিতে ধূমকেতু এক্স টিম বেসরকারিভাবে দেশের প্রথম সফল সাউন্ডিং রকেট টেস্ট সম্পন্ন করে, যার নাম ছিল 'ধূমকেতু ০.০১' (পুঁটি মাছ)। সেটির রেঞ্জ ছিল এক কিলোমিটার।

২০২৩ সালের নভেম্বরে ময়মনসিংহ শহরের টাউন হল মাঠে 'একুশে-০১' রকেটটি তারা প্রদর্শনও করেন। ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের মেয়র এবং ধূমকেতু এক্সের উপদেষ্টা ইকরামুল হক টিটু এটি উন্মোচন করেন। রকেট একুশের ওজন ছিল ৪৫ কেজি। লম্বায় ১২ ফুট। ব্যাস সাড়ে ছয় ইঞ্চি। এটিকে সাউন্ডিং রকেটও বলা হয়। সাউন্ডিং রকেট হলো এক বা দুই পর্যায়ের প্রপেলান্ট রকেট, যা উচ্চ বায়ুমণ্ডলীয় অঞ্চল অনুসন্ধান এবং মহাকাশ গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি রকেট তৈরি করতে ছয় মাস থেকে এক বছর সময় লেগে যায়।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

প্রাণীদের ঘুম রহস্য

আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা একবার ঘুমালে ১০ /১২ ঘণ্টার আগে ঘুম ভাঙে না। আবার অনেকে ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা ঘুমিয়েই ফ্রেস বোধ করেন। এটাতো মানুষের ক্ষেত্রে। তবে প্রাণীদের ক্ষেত্রেও ঘুমের কিছু নিয়ম রয়েছে যা জানলে বন্ধুরা তোমাদের পিলে চমকে উঠবে। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা যায় একেক প্রাণীর ঘুম একেক রকম। ভালুকের মতো দেখতে একটি প্রাণী নাম কোয়ালা। এরা দিনে প্রায় ১৫ থেকে ২০ ঘণ্টা ঘুমায়। তার মানে ২৪ ঘণ্টায় কোয়ালারা মাত্র ৪ থেকে ৯ ঘণ্টা জেগে থাকে। পাইথন সাপ দিনে ১৮ ঘণ্টা ঘুমায়। তবে ব্যতিক্রমও রয়েছে যেমন- স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে মাত্র দুই ঘণ্টা ঘুমায় ঘোড়া। শুধু ঘুমের সময়ই নয়, ঘুমানোর ধরনেও বেশ বৈচিত্র্য রয়েছে প্রাণীদের মধ্যে। শুয়ে, বসে বা গাছে হেলান দিয়ে ঘুমাতে পারে বিভিন্ন প্রাণী। প্রাণীদের ঘুমের ধরন সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

ডলফিন

ডলফিন এমন একটি প্রাণী যারা কিনা প্রায় সারা জীবন পানিতে কাটায়। যদিও স্তন্যপায়ী প্রাণী হিসেবে তাদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করতে হয়। তোমরা শুনে অবাক হবে ঘুমানোর সময় ডলফিনের মস্তিষ্কের অর্ধেক অংশ বিশ্রাম নেয়, বাকি অর্ধেক অংশ সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সচল থাকে। এরা ঘুমানোর সময় সাধারণত এক চোখ খোলা রেখে পানিতে কাঠের টুকরার মতো ভেসে থাকে। এরা টানা পাঁচ দিন না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে ।

তিমি

তিমিও ডলফিনের মতো ঘুমের সময় মস্তিষ্কের অর্ধেক অংশ নিষ্ক্রিয় করে ফেলে এবং এক চোখ খোলা রেখে ঘুমায়। স্পার্ম প্রজাতির তিমি ঘুমানোর সময় মাথা ওপরে রেখে খাড়াভাবে ঘুমায়। তবে হাম্পব্যাক প্রজাতির তিমি ঘুমায় পানিতে স্থির হয়ে। তিমির মধ্যে কিছু প্রজাতি রয়েছে যারা মাত্র ৩০ মিনিট ঘুমায়। কারণ, বেশি ঘুমালে তাদের শরীরের তাপমাত্রা কমে যায়। তাই এই প্রজাতির তিমিরা জন্মের প্রথম মাসে ঘুমায় না।

হাতি

পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে কম ঘুমায় আফ্রিকার বুনো হাতি। দিন-রাত মিলে এরা গড়ে মাত্র দুই ঘণ্টা ঘুমায়। বেশিরভাগ সময় দাঁড়িয়ে ঘুমায় হাতি।

সাধারণত রাতের মধ্যেই হাতিরা তাদের সংক্ষিপ্ত ঘুম সেরে নেয়। তবে চিড়িয়াখানায় থাকা হাতিরা দৈনিক চার থেকে ছয় ঘণ্টা ঘুমায়। কিন্তু জঙ্গলের হাতি ঘুমায় মাত্র দুই ঘণ্টা। আর সিংহ কিংবা শিকারিদের হাত থেকে পালানোর দরকার হলে লম্বা পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য এরা চার-পাঁচ দিনে কোনো বিশ্রামই নেয় না।

কোয়ালা

ছোট্ট প্রাণী কোয়ালা। দেখতে অনেকটা ভালুকের মতো।

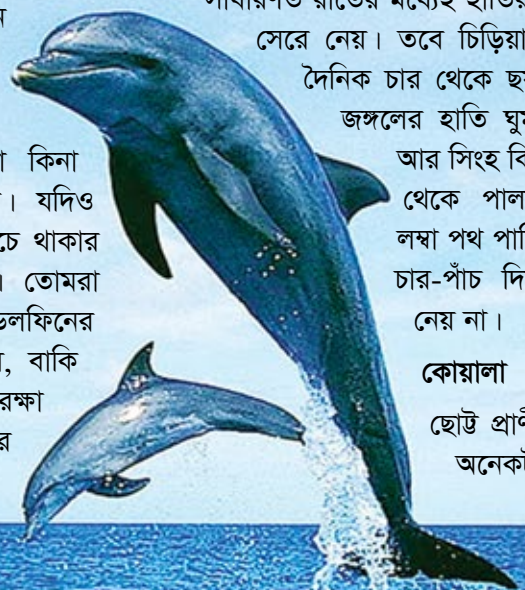

চিড়িয়াখানায় থাকা কোয়ালা দিনে ২২ ঘণ্টা নিয়মিত ঘুমায়। তবে বন্য কোয়ালা দিনে প্রায় ১৪ ঘণ্টা ঘুমায় আর বাকি সময় বিশ্রাম নেয়। কোয়ালা সাধারণত ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা খায়। এই পাতা হজম হতে অনেক সময় ও শক্তির প্রয়োজন হয় বলে কোয়ালা বেশি ঘুমায়।

সিন্ধুঘোটক

সিন্ধুঘোটক মূলত আর্কটিক অঞ্চলের স্তন্যপায়ী প্রাণী। এরা বরফাচ্ছাদিত জলাধারে বাস করলেও যে -কোনো জায়গায় ঘুমানোর ক্ষমতা রয়েছে প্রাণীটির। সমুদ্রের গরু হিসেবে পরিচিত এই প্রাণী ভাসমান অবস্থায় ঘুমানোর পাশাপাশি সমুদ্রতটে বা বরফের ওপরও ঘুমাতে পারে।

ব্যাঙ

আমাদের গ্রহের সব ধরনের পরিবেশে ব্যাঙ দেখা যায়। শীতকালে ঘুমের কৌশল হিসেবে চিরনিদ্রা বা হাইবারনেশন কৌশল অনুসরণ করে ব্যাঙ। ব্যাঙের ঘুম বেশ রহস্যময় বিষয় বটে। ব্যাঙ আসলে ঘুমায়, নাকি নিস্তেজ হয়ে থাকে, তা নিয়ে নানা গবেষণা চলছে আজো। নিকটাটিং মেমব্রেন নামের চোখের পাতা দিয়ে চোখ ঢেকে রাখে ব্যাঙ।

ঘোড়া

আমরা সবাই জানি ঘোড়া দাঁড়িয়ে ঘুমায় এবং দিনের বেশিরভাগ সময়ই ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকে। ব্যাপারটা নিয়ে সবার মনেই হয়ত কৌতূহল আছে। ঘোড়া কি কখনোই শুয়ে ঘুমায় না? ঘুমায়, দিনের কিছুটা সময় ঘোড়াকেও শুয়ে ঘুমোতে হয়। তবে বলা যায় শিকারির কবল থেকে দ্রুত রক্ষা পেতেই ঘোড়া দাঁড়িয়ে ঘুমায়। পরিবেশ নিরাপদ আর নিশ্চিন্ত মনে করলেই কেবল ঘোড়া শুয়ে ঘুমায়। তবে সেটা বেশিক্ষণ না। কেননা দীর্ঘক্ষণ শুয়ে থাকলে ঘোড়ার শরীরে রক্ত চলাচলে সমস্যা হয়। তাই ঘুম সম্পন্ন হলেই ঘোড়া উঠে দাঁড়ায়।

প্রতিবেদন : বশিরুল আলম

নাফিসা তাবাসসুম তাজ, নবম শ্রেণি, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় 'খ' ইউনিটের কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ থেকে প্রথম হয়েছেন প্রিয়ন্তী মণ্ডল। সে খুলনার সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজের শিক্ষার্থী। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ১০৫ দশমিক ২৫ নম্বর পেয়েছেন। ২৮শে মার্চ বিকেলে অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

কোনো নিয়মের মধ্যে পড়াশোনা করেননি প্রিয়ন্তী। তবে পরিকল্পনা করে পড়াশোনা করতেন যেদিন যে বিষয়ে হাত দিতেন, সেদিন সেটি শেষ করতেন। মূলত পরিশ্রম ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি অগাধ আস্থা তার সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে প্রিয়ন্তী মনে করেন।

প্রিয়ন্তী বরাবরই খুব মেধাবী। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি পেয়েছে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে পাস করে। ২০২১ সালে এসএসসি পাস করেন মাগুরার শালিখা উপজেলার আড়পাড়া সরকারি আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে।

প্রিয়ন্তীর গ্রামের বাড়ি খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায়। বাবা পঙ্কজ মণ্ডল অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। পঙ্কজ মণ্ডলের দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রিয়ন্তী ছোটো।

প্রিয়ন্তীর বিশ্বাস ছিল, 'মেধাতালিকায় নাম আসবে। তবে এত ভালো হবে জানা ছিল না। আইন বিষয়ে পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে বিচারক হতে চায় প্রিয়ন্তী।'

আত্মরক্ষার কৌশল শিখলেন চবি নারী শিক্ষার্থীরা

সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন ছাত্রীরা। সামনে থেকে একের পর এক নির্দেশনা দিচ্ছেন প্রশিক্ষক। ছাত্রীরা অনুসরণ করছেন, শিখছেন খালি হাতে নিজেকে রক্ষার নানা কৌশল, যেটি সবার কাছে কারাতে নামে পরিচিত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) প্রীতিলতা হলের খেলার মাঠে ১০ ও ১১ই মার্চ এমন দৃশ্য দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ছাত্রীদের জন্য আত্মরক্ষার এ কর্মশালার আয়োজন করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। সহযোগিতায় ছিল বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ। দুই দিনের এ কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অন্তত ৫০ নারী শিক্ষার্থী অংশ নেন।

প্রশিক্ষণের গুরুত্বের কথা জানিয়ে প্রশিক্ষক অজয় দে বলেন, 'বর্তমান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। নারীদের চলার পথে সহিংসতাও বিব্রতকর অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কারাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি পরিবার থেকে অন্তত একজন কারাতের প্রশিক্ষণ নিলে যে-কোনো বিপদে আত্মরক্ষা করা যায়।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

ইউটিউব দেখে বিমান তৈরি

ইউটিউব দেখেই রিমোট কন্ট্রোল বিমান তৈরি এবং সেটা উড়িয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন সিয়াম। সে স্থানীয় সুতি ভিএম পাইলট মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের কারিগরি শাখার ১০ম শ্রেণির ছাত্র। তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার হাট বৈরান।

ছোটোবেলা থেকেই কারিগরি কাজের প্রতি ঝোঁক মো. সিয়ামের। পিতার মোবাইল দিয়ে ইউটিউবে বিমান বানানো দেখেই ইচ্ছা জাগে বিমান বানানোর। পাঁচ বছর ধরে এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সে অনুযায়ী অনলাইন শপের মাধ্যমে এবং সশরীরে ঢাকা থেকেও যন্ত্রপাতি কিনে। আমেরিকান যুদ্ধ বিমান এফ ২২ র‍্যাপ্টরের আদলে বানানো বিমানটির নাম দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু এফ ২২ র‍্যাপ্টর।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা গোপালপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবং সূতি ভি এম সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ আরো অনেক গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সিয়ামের বিমান প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন।

মো. সিয়াম জানান, পর্যাপ্ত অর্থ সহায়তা পেলে কৃষি কাজে ব্যবহৃত ড্রোন বানানোসহ, ক্যামেরা লাগিয়ে শতমাইল দূরে নজরদারি বিমান বানিয়ে দেশকে সহযোগিতা করতে পারবে। সরকার সুযোগ দিলে যুদ্ধ বিমান বানানোর কাজে সহযোগিতা করে দেশকে এগিয়ে নিতে চায় সিয়াম। বিমানটি বানানোর পর বাড়ির আঙিনায় সাময়িক উড়ানো হয়।

সুতি ভিএম পাইলট মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আতিকুর রহমান বলেন, সিয়ামের মেধা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি। আজ থেকে ওর গবেষণায় যা দরকার হবে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হবে এবং আর্থিক সহায়তার জন্য ইউএনও মহোদয়কে অনুরোধ করব।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. জুলফিকার হায়দার বলেন, গ্রামের বাসিন্দা সিয়ামের প্রতিভা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেছি, ওর বানানো জেট বিমানটি চমৎকার লেগেছে। নিজের টাকায় এরকম একটি প্রকল্প হাতে নিয়ে ও যে সার্থক হয়েছে এটি আমার কাছে ভালো লেগেছে। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কথা বলে ওকে আর্থিক সহায়তা করার চেষ্টা করব।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

বিড়ালের শহর

বন্ধুরা, তোমাদেরকে আজ এমন একটি শহরের কথা বলব যেখানে শুধুই বিড়ালের রাজত্ব চলে! কি অবাক হচ্ছো! পৃথিবীতে এমন একটি শহর রয়েছে যেখানে বিড়ালপ্রেমীরা গেলে তাদের আর ফিরে আসতে মন চাইবে না। এই বিড়ালের শহরটি হচ্ছে ইউরোপের মন্টিনিগ্রোর শহর কোটর। সেখানকার প্রায় প্রতিটি রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে শুধু বিড়াল। ২০১২ সালে এখানে প্রথম বিড়াল-থিমযুক্ত স্যুভেনির দোকান খোলা হয়েছিল– যার নাম ক্যাটস অব কোটর।

এখানে বিড়ালর উপর তৈরি অনেক জাদুঘর খোলা হয়েছে। শীতের দিনে এই বিড়ালগুলোকে সাধারণ মানুষ তাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায়। এই শহরের শত শত বিড়ালদের শহুরে রেস্তোরাঁ, বার, মুদি দোকান এবং ছোটো ছোটো খাবারের দোকানগুলো খাবার সরবরাহ করে। শহরের বাসিন্দারা বিশ্বাস করেন যে, বিড়ালগুলোকে অতীতে নাবিকেরা এই শহরে নিয়ে এসেছিলেন এবং এই বিড়ালগুলো শহরটিকে অনেক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। ২০২৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী, এখানে এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৮৬২টি বিড়াল হয়েছে।

মানুষের চেয়ে গাছ বেশি

গাছ আমাদের পরম বন্ধু। আজ এমন এক শহরের কথা বলব যেখানে মানুষের চেয়ে গাছের সংখ্যা বেশি! যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ ইয়র্কশায়ারের বৃহত্তম শহর শেফিল্ড। নদী আর উপত্যকায় ঘেরা সবুজময় এক শান্তির শহর। আবার এখানেই রয়েছে ৪২৫ টন ওজন ও ১২ হাজার হর্সপাওয়ারের রিভার ডন ইঞ্জিন। তারপরেও এই শহরটি সবসময় থাকে শীতল। কারণ হলো সেখানে মানুষের চেয়ে গাছের সংখ্যা বেশি। শহরটির কেন্দ্রে ৬১ শতাংশ জুড়ে রয়েছে পার্ক, বনভূমি আর পরিকল্পিত দর্শনীয় বাগান। শহরজুড়ে সাড়ে পাঁচ লাখ জনসংখ্যার বিপরীতে রয়েছে ৪৫ লাখের বেশি গাছ। শহরের প্রতি বাসিন্দার বিপরীতে রয়েছে কমপক্ষে ৮০টি গাছ। এ কারণে ২০২২ সালে শেফিল্ডকে বিশ্বের অন্যতম আন্তর্জাতিক 'ট্রি সিটি' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো লণ্ঠন

চীনের একটি শহরে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো লণ্ঠন তৈরি করে গড়েছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস। গোলাপের বড়ো আকৃতিতে তৈরি করা হয়েছে লণ্ঠনটি। গিনেস কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিয়েছে, চলতি ড্রাগন বছরের বসন্ত উৎসবে লাউইয়াংস পিউনি প্যাভিলিয়নে এই লণ্ঠন বানানো হয়েছে। লাউইয়াং শহরে তৈরি গোলাপ আকৃতির এই লণ্ঠন প্রায় ১৪৭ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা, ৮১ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু এবং ৬৪ ফুট ৮ ইঞ্চি চওড়া। ওজন প্রায় ৯৯ হাজার ২০৮ পাউন্ড। এটিকে দাঁড় করিয়ে রাখতে ৮৮ হাজার ১৮৪ পাউন্ড ওজনের স্থাপনা যুক্ত করতে হয়েছে। চোখ-ধাঁধানো এই গোলাপ আকৃতির লণ্ঠন আটতলা ভবনের সমান উঁচু। ভেতরে ৫৩ হাজার আলোর উৎস রাখা হয়েছে। লণ্ঠনে ছয় স্তরে ৩৬টি মূল পাপড়ি বসানো হয়েছে। বাইরের দিকের প্রতিটি পাপড়ির ওজন প্রায় ৮০০ কেজি এবং দৈর্ঘ্য ৩২ ফুট ৯ ইঞ্চির বেশি। ২০০ কারিগরের তৈরি এই লণ্ঠনে রয়েছে চীনের জাতীয় ঐতিহ্যের ছাপ। রঙের ব্যবহার আর অলংকরণে ফুটে উঠেছে মুনশিয়ানা।

প্রতিবদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

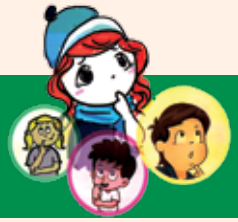

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় যে খেলা, ৪. একশত বছর, ৫. নির্যাস, ৬. প্রয়োজন, ৮. হিতোপদেশ

উপর-নিচ:

১. পুকুর, ২.ইনাম, ৩.যে খেলায় অংশগ্রহণ করে, ৫.এক প্রকার সাদা ফুল, ৬.ঢিলেমি, ৭.গাছের ছাল

১.				২.		৩.	
	■	■	■		■		■
৪.			■		■		■
	■	■	৫.		■		■
■	৬.			■	৭.	■	■
■		■	৮.				■
■		■		■		■	■
■		■		■	■	■	■

ছক মিলাও

শব্দধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: আড়াইহাজার, জাল, জাতি, মাড়াই, মহাসাগর, আগরবাতি, বালি, লুইপা, পারাপার, পাতাল, মই

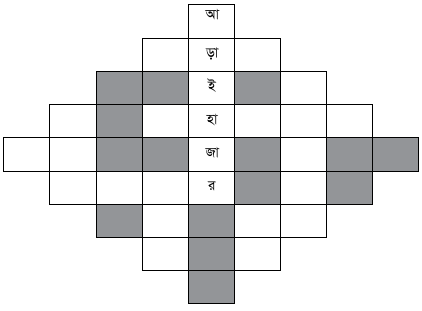

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

২৩		২৭		২৯				৩৯
	২৫		৩১		৩৫		৪৩	
২১		১৯		৩৩		৪৫		৪১
	৩		৪৯		৪৭		৫৯	
১		১৭		৫৩		৫৭		৬১
	৫		৫১		৫৫		৬২	
৭		১৫		৭৪		৭২		৬৪
	১৩		৭৬				৬৬	
৯		১১		৭৮	৮১	৭০		৬৮

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

১	*		-	৩	=	
+	■	+	■	-	■	+
	-	২	*		=	২
/	■	-	■	+	■	+
২	*		-	৪	=	
=	■	=	■	=	■	=
	*	৪	-		=	৬

মার্চ মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

স্বা	ধী	ন	তা	পু	র	স্কা	র
ভা		দী		ম্পো			বা
বি		মা		দ্যা			হূ
ক		তৃ		ন			ত
	আ	ক	ল			দ	
	কা		তি			রি	
	শ		কা	ঠ্ঠ	রি	য়া	
					ক্ত		

ছক মিলাও

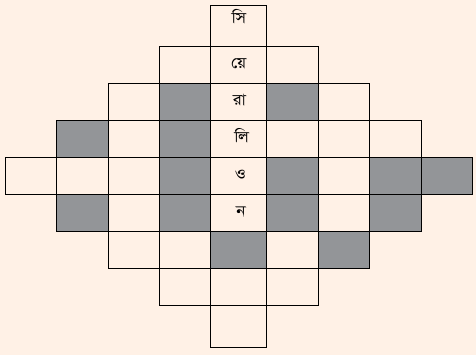

ব্রেইন ইকুয়েশন

৯	+	১	-	৫	=	৫
/		+		+		-
৩	*	২	-	১	=	৫
+		+		-		+
২	+	৩	+	২	=	৭
=		=		=		
৫	+	৬	-	৪	=	৭

নাম্ব্রিক্স

১৯	২০	২১	৩০	৩১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫
১৮	২৩	২২	২৯	৩২	৫১	৫৮	৫৭	৫৬
১৭	২৪	২৭	২৮	৩৩	৫০	৫৯	৬০	৬১
১৬	২৫	২৬	৩৫	৩৪	৪৯	৪৮	৬৩	৬২
১৫	১৪	১৩	৩৬	৪৫	৪৬	৪৭	৬৪	৮১
২	৩	১২	৩৭	৪৪	৬৭	৬৬	৬৫	৮০
১	৪	১১	৩৮	৪৩	৬৮	৭৩	৭৪	৭৯
৬	৫	১০	৩৯	৪২	৬৯	৭২	৭৫	৭৮
৭	৮	৯	৪০	৪১	৭০	৭১	৭৬	৭৭

নুরুন নাহার মিম, পঞ্চম শ্রেণি, পয়ালগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বরুড়া, কুমিল্লা

সাবা তাসনিম, পঞ্চম শ্রেণি, রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

আফিয়া যাহীন খান, নবম শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

হিট স্ট্রোক প্রতিরোধে করণীয়

- দিনের বেলায় যথাসম্ভব বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকুন, রোদ এড়িয়ে চলুন

- বাইরে বের হলে ছাতা, টুপি/ক্যাপ, বা কাপড় দিয়ে মাথা যথাসম্ভব ঢেকে রাখুন

- হালকা রঙের, ঢিলে ঢালা এবং সম্ভব হলে সুতির জামা পরুন

- প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করুন

- সহজে হজম হয় এমন খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন ও বাসি, খোলা খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন

- দিনের বেলায় একটানা শারীরিক পরিশ্রম করা থেকে বিরত থাকুন

- সম্ভব হলে একাধিকবার পানির ঝাপটা নিন বা গোসল করুন

- প্রস্রাবের রঙের দিকে নজর রাখুন, তা হলুদ বা গাঢ় হলে অবশ্যই পানি পানের পরিমাণ বাড়ান

- ঘরের পরিবেশ যেন অতিরিক্ত গরম বা ভ্যাপসা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন

- বেশি অসুস্থ বোধ করলে দ্রুত নিকটস্থ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

সবচেয়ে ঝুঁকিতে যারা

- শিশু
- বয়স্ক ব্যক্তি
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
- শ্রমজীবী ব্যক্তি, যেমন রিকশাচালক, কৃষক, নির্মাণশ্রমিক
- যাদের ওজন বেশি
- যারা শারীরিকভাবে অসুস্থ, বিশেষ করে যাদের হৃদরোগ বা উচ্চ রক্তচাপ আছে

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-48, No-10. April 2024, Tk-20.00

Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

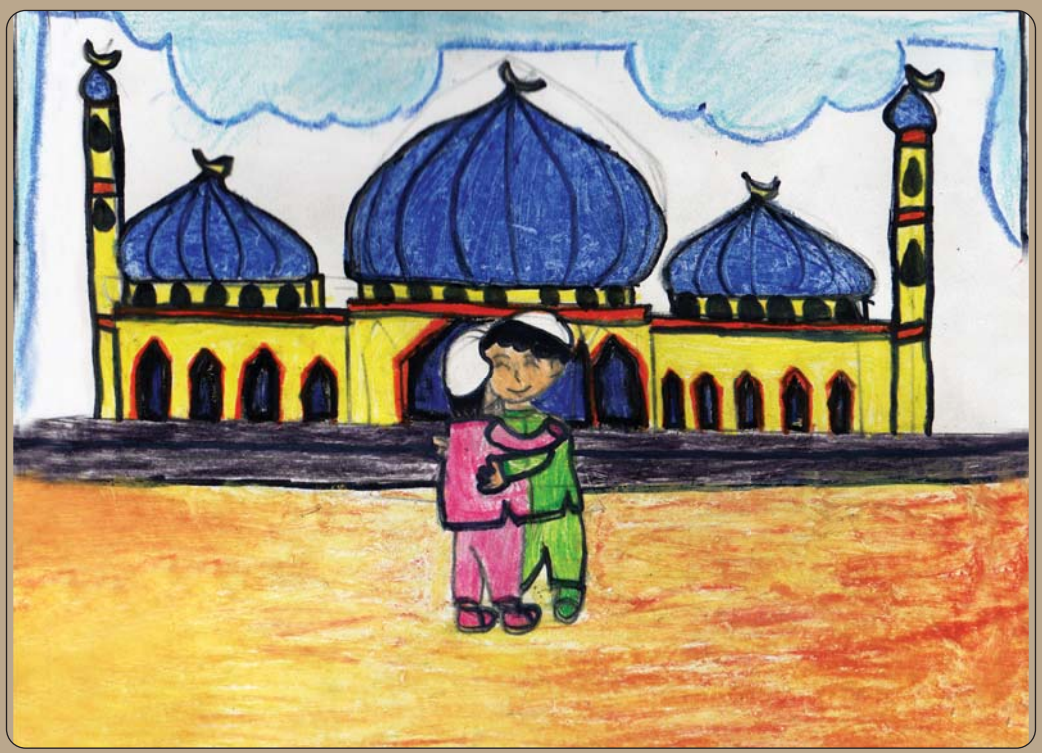

সিরাজুম মুনিরা বিভা, প্রথম শ্রেণি, সিদ্বেশ্বরী গালর্স হাই স্কুল, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

তথ্য ভবন

১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা